রামগোলাম

হরিশংকর জলদাস

রামগোলাম

হরিশংকর জলদাস

রামগোলাম কৈশোরে পা দিলে গুরুচরণের পরিবারে আবাসন সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। ছেলেকে বিয়ে করানোর পর থেকে গুরুচরণ-অঞ্জলি রান্নাঘরে ঠাঁই নিয়েছিল। শিউ-চাঁপা শুতো একমাত্র থাকার ঘরটিতে। খাটিয়াটি দেয়ালে ঠেসে রাখা হতো দিনের বেলায়, শুধু দিনের বেলায় কেন রাতের রান্না এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর খাটিয়া বিছানো হতো, অঞ্জলি এবং গুরুচরণ সতর্কতার সঙ্গে দেহ পাতত সেই খাটিয়ায়। এখনো সেই নিয়ম অব্যাহত আছে। দুপুরে বা বিকেলে শরীরটা যখন একটু আইঢাই করে শোয়ার জন্য, সম্ভব হয় না। অঞ্জলি মাঝে মাঝে বউয়ের বিছানায় একটু জিরিয়ে নেয়, কিন্তু গুরুচরণ তাও করে না। বিবাহিত ছেলের বিছানায় শোয়াকে গর্হিত কাজ মনে করে গুরুচরণ। শরীর যেদিন একেবারেই বাধা মানে না, বারান্দার এক পাশে একটা কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

রামগোলাম যখন একটু মাথা তোলা হলো, শিউচরণ বিছানা ছাড়ল। মা-ছেলে খাটিয়ায় শুতো। খাটিয়ার পাশে একজন মানুষের চিৎ হয়ে শোয়ার মতো জায়গা। ওখানেই চাটাই পেতে কোনোরকমে রাত কাবার করত শিউচরণ। কোনো কোনো রাতে মনটা একেবারে পাগলপারা হয়ে উঠত; হাত বাড়ালেই চাঁপারানীকে ছোঁয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না। ডানহাতটা নিজের দিকে টেনে নিত শিউচরণ, আঙুলের ভাষা দিয়ে চাঁপারানীকে বুঝিয়ে দিত—আজ আমার দেহটা বড় আকুলিবিকুলি করছে চাঁপা, তুমি একটা কিছু করো।

আঙুল দিয়ে কোমল পরশ বুলাত চাঁপা শিউর হাতে। হাতের ভাষায় সে এই আকুতি প্রকাশ করত—আমি কী করতে পারি বল! তুমি যেমন আমাকে চাইছ, আমিও তো তোমাকে চাইছি। কিন্তু কী করে সম্ভব! রামগোলাম বড় হয়ে উঠছে, ধীরে ধীরে সব বুঝতে শিখছে; সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে—বুঝতে পারছি না। কী করে আমি তোমার ডাকে সাড়া দিই বল। আস্তে করে শিউচরণ হাত ছাড়িয়ে নেয়। দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ চাঁপারানীর কানে পৌঁছে। ঈশ্বরের ওপর তার খুব রাগ হয় এইসময়। ছোটজাতে পাঠিয়েছে প্রভু, তা-ও মেনে নিলাম। তাই বলে কি আমাদের দুটো শোয়ার ঘর থাকতে নেই ? গরিব করেছ তাও ঠিক আছে প্রভু, স্বামীতে-স্ত্রীতে একসঙ্গে রাত কাটাবার জায়গাটুকু পর্যন্ত দিলে না। যে রাতে দুজনে দুজনকে পাওয়ার জন্য মাতাল হয়ে ওঠে, বারান্দায় বেরিয়ে আসে। বারান্দার দক্ষিণকোণে চেয়ার ভাঙা, সাইকেলের নষ্ট টায়ার, ছেদা-প্লাস্টিকের বালতি-গামলা, ভাঙা বেতের দোলনা জড়ো করে রাখা। ওইগুলোকে একটু সরিয়ে-নড়িয়ে মা-বাপের চোখের আড়ালে ভেতরের দিকে একটি কোটরের মতো করেছে শিউচরণ। ওই কোটরেই ঢুকে পড়ে দুজনে।

রামগোলাম যখন ফাইভ পাস করে মিউনিসিপাল হাইস্কুলে ভর্তি হলো, তখন চাঁপারানী বেঁকে বসল—রামগোলামকে আলাদা ঘর দিতে হবে, পড়াশোনার সুবিধা করে দিতে হবে। এইসব দাবির মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত শিউচরণ।

'তুমি কিছু বলছ না যে ?' চাঁপার কণ্ঠে মৃদু উষ্মা।

'আমি কী করব বলো ? ভেতর-বাহির সব তোমার জানা। তুমি যদি এখন আমাকে একটা শাড়ি এনে দিতে বল, পারব। যদি বলো—একটা নতুন খাটিয়া এনে দিতে, তাও পারব। যদি বলো—আমি এখনই শূকরের মাংস খেতে চাই, যে-কোনো দামে যোগাড় করব। কিন্তু ঘর ? ঘর আমি কোথা থেকে যোগাড় করব চাঁপা ? দুর্মর বেদনা শিউচরণের কণ্ঠে।

চাঁপারানী সে বেলা চুপ মেরে যায়। কিন্তু দিন দশেক পরে উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি তুঙ্গে ওঠে। প্রসঙ্গ একটাই—যে করেই হোক রামগোলামের আলাদা শোবার ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এবারও শিউচরণ কী একটা খোঁড়া যুক্তি খাড়া করাতে চাইল চাঁপারানীর সামনে। চাঁপারানী এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল শিউচরণের যুক্তি। চাঁপারানীর উষ্মামিশ্রিত উচ্চকণ্ঠের নিচে শিউচরণের হতাশ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। ওপাশের ঘর থেকে গুরুচরণ বউয়ের কথা শুনল—'আমাকে আর কোনো যুক্তি দেখাবে না। মাথা তোলা ছেলে নিয়ে শুয়োরের জীবন কাটাতে পারব না এক ঘরে। তোমার লজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। কালকে যেভাবেই হোক রামগোলামের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করবে, ব্যস। এই আমার শেষ কথা।'

শিউচরণ মিউমিউ করে কী যেন বলল। কথাগুলো গুরুচরণ ভালো করে শুনতে পেল না।

খুব ভোরে চাঁপারানী বিছানা ছাড়ে। আলু ভাজে বা একটা সবজি রাঁধে। তারপর রুটি তৈরিতে বসে। মোটা ছেঁকা রুটি। প্রত্যেকের জন্য দুটো করে মোট দশটি রুটি ছেঁকতে ছেঁকতে অঞ্জলির পাশে এসে বসে। সকালের রুটি ছেঁকা বা সবজি রাঁধার কাজটি বারান্দায় করে চাঁপারানী। কেরোসিনের স্টোভে রান্না-ছেঁকার কাজ শেষ করে আনতে না আনতে গুরুচরণ, শিউচরণ এসে যায় চুলার পাশে। রুটি সবজি খেয়ে কর্পোরেশনের উদ্দেশে রওনা দেয়। মেয়েদের একটু পরে গেলে চলে। স্নান সেরে, নিজেদেরটা খেয়ে রামগোলামের রুটি-সবজি ঢেকেঢুকে বউ-শাশুড়ি রওনা দেয়। রামগোলাম একটু দেরিতে ওঠে।

আজ গুরুচরণ রুটি-সবজি খেল, কিন্তু কাজে গেল না। অঞ্জলির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, 'আজ কাজে যেতে ইচ্ছে করছে না। যাব না। তোমরা যাও।'

'মানে ? জমাদারবাবু বকবে না ?' অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে।

'বকলে একটা জবাব দিয়ে দেব। তুফান মেইল তো চালাই না এখন আমি। আমার জন্য কাজ আটকে থাকবে না। তোমরা যাও। রামগোলামের স্কুল দেরি আছে, তাকে নিয়ে সময় কেটে যাবে আমার।' গুরুচরণ বলল।

ওরা চলে গেলে গামছা কোমরে বেঁধে কাজে হাত দিল গুরুচরণ। দক্ষিণবারান্দায় জমান্যে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র টেনে হেঁচড়ে উত্তর দিকে নিয়ে এল। নিচে গিয়ে শ্যামলালকে ডেকে আনল। মদ খেয়ে বড়বাবুকে 'বেহেনচোদ শালা' বলার অপরাধে চাকরি গেছে শ্যামলালের। তাকে নিয়ে সেই বারান্দার ডানে-বাঁয়ে সাফসোফ করল। ব্রিজঘাটে গিয়ে পাতিবাঁশ নিয়ে এল। তার নিয়ে এল জ্লসিমের দোকান থেকে। তারপর বাঁশে এবং তারে দুজন হাত লাগাল। রামগোলাম স্কুলে রওনা দেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা কী করছ ?'

গুরুচরণ হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'রাজমহল তৈয়ার করছি রামচন্দ্রের জন্য।'

রামগোলাম কিছুই বুঝল না। একটু থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপর স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিল।

দুপুরে সবাই ফিরে দেখল দক্ষিণের বারান্দায় একটা ঘর তৈরি হয়ে গেছে। ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির সর্দারজি বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলার চৌদ্দ নম্বর ঘরের সামনের বারান্দায় এই ছোট্ট কামরাটি অন্যজনের জন্য কিছুই না, কিন্তু বেড়া-প্লাস্টিক আর পুরোনো পত্রিকায় তৈরি এই ঘরটি গুরুচরণের পরিবারে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করল। চাঁপারানী লজ্জা-লজ্জা মুখ নিয়ে একবার ঘরটির দিকে আরবার শ্বশুরের দিকে তাকাতে লাগল। তার অন্তরে পরম তৃপ্তির ঢেউ। শিউচরণ হতভম্ব হয়ে ঘরটির দিকে তাকিয়েই থাকল। ভাবল—রাতে চাঁপারানীর কথাগুলো নিশ্চয়ই বাপজী শুনতে পেয়েছে। তাই চাকরিতে না গিয়ে ঘরটি তুলেছে বাপ। আফসোস হলো—চাঁপারানী তো অনেকদিন ধরে আলাদা ঘরের দাবি জানিয়ে আসছিল। বোকা হাঁদারাম আমি! আমার মাথায় বাপের এই বুদ্ধিটা খেলল না কেন ? বাপের এই কাজটি যদি আমি করতাম, তাহলে চাঁপা কী খুশিই না হতো! বিয়ের পর থেকে চাঁপা বিশ্বাস করে এসেছে যে সর্দারজীর সামান্য বুদ্ধিও আমার ঘটে নেই। বাপের অর্ধেক গুণও যদি আমি পেতাম, তাহলে সমাজের মানুষ আরও শ্রদ্ধার চোখে দেখত আমাকে। নিজেকে গুণী এবং করিতকর্মা হিসেবে প্রমাণ করার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার আনন্দে মন ভরে গেল—এই ভেবে যে এত বড় বুদ্ধির কাজটি আমার বাপই তো করেছে। হরিজনপল্লীর কারও দুটোর ওপর তিনটি ঘর নেই। সবার ঘরের সামনে দিয়ে টানা বারান্দা, সেখানে মানুষের নিত্য হাঁটাহাঁটি। বাপ সর্দারজী বলে ওই সময়ে দক্ষিণের ঘরটি পেয়েছিল। এতদিন অকেজো অবস্থায় পড়েছিল। আজ বাপ সেই ভাঙাচোরা জিনিসে ভরা দক্ষিণের বারান্দাটিকে একটি সুন্দর ঘরে পরিণত করেছে। চাঁপারানীর চাপা ক্ষোভ এবার কমবে।

রামগোলাম স্কুল থেকে ফিরে ধেইধেই করে নাচতে নাচতে ঘরটিতে ঢুকে গেল। দক্ষিণের ছোট খুপড়ি জানালায় মাথা গলিয়ে দিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু এ ঘর কার জন্য ? তুমি আর দাদি থাকবে বুঝি এ ঘরে ? কী মজা হবে।'

গুরুচরণ ঘরে ঢুকে রামগোলামের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল,

'নারে পাগলা, দাদির জন্য না, তোমার জন্যই এই ঘর বানিয়েছি। আজ থেকে এই ঘরে তুমি থাকবে। পড়বে, শোবে।'

শুধু অঞ্জলি কিছু বলল না। ঘরটির সামনে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মুখে প্রশংসা আর আনন্দের কারিকুরি। স্বামীর জন্য নিবিড় প্রশংসা আর ভেতরের বিপুল আনন্দ তার বয়সী মুখের বলিরেখাকে ছাপিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে।

রাতে পাশে শুয়ে অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল, 'আজ তাহলে তুমি এই জন্যই কাজে যাও নি সর্দারজী?'

'তুমি কাল রাতে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলে। অর্ধেক রাতে রামগোলামের মায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সবকথা বুঝতে পারলাম না। শুধু শিউর বউয়ের একটি কথা আমার কানে ধাক্কা মারল—তোমার লজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। কালকে যেভাবেই হোক রামগোলামের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করবে।' গুরুচরণ বলল।

'কালকে খুব খাটুনি গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, বেশি ঘুম পেয়েছিল আমার। শুনতে পাই নি আমি বউয়ের কথা।' অঞ্জলি বলল।

গুরুচরণ বলল, 'ঘুম ঘুম চোখ ছিল আমারও। রামগোলামের মায়ের কথায় ঘুম ভেঙে গেল। ওর গলায় হতাশা ছিল, সবচাইতে বেশি ছিল লজ্জা।'

'কী জীবন আমাদের কুকুর শেয়ালের জীবন।' বেদনা মেশানো কণ্ঠ অঞ্জলির। অঞ্জলির কথা যেন কানে ঢুকে নি গুরুচরণের। আপন মনে বলতে লাগল, 'চার পল্লীর সর্দার আমি। সবাই শ্রদ্ধা করে আমাকে। মনে করে আমার অনেক ক্ষমতা। কিন্তু আমি যে ঠুঁটো জগন্নাথ। ছেলে আর ছেলের বউকে নিজেদের মতো করে রাতে শোবার জায়গাটি পর্যন্ত দিতে পারি না। বউ দাবি জানিয়েছিল শিউর কাছে—রামগোলামের জন্য আলাদা ঘর চাই। ছেলের সামনে আর নির্লজ্জ হতে পারবে না সে।'

'হায়রে ঈশ্বর।' অঞ্জলির বুক চিরে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

গুরুচরণ বলল, 'ঈশ্বরকে আর দোষ দিয়ে লাভ কী? ছোটজাতে জন্মেছি। আগের জীবনের কর্মফলের সাজা তো আমাদের পেতে হবে। দুটো ঘরই তো আমাদের জন্য নির্ধারিত।' বলেই হা হা হা করে-হেসে উঠল। গুরুচরণের গম্ভীর কণ্ঠের উচ্চহাস্য রান্নাঘর ছাপিয়ে শিউচরণের ঘর পেরিয়ে হরিজন পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল সেই নিবিড় নির্জন রাতে।

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলল, 'আহা! পাগলের মতো হাসছ কেন? ছেলে আর বউ শুনতে পেলে কী ভাববে?'

'হাসছি কি এমনে এমনে। বাবাঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল, তাই হাসলাম।'

'কী কথা মনে পড়ল তোমার?'

'মনু নামে নাকি এক ঋষি ছিল পুরানা কালে। একটা বই লিখে গেছে নাকি সেই ঋষি। কী সংহিতা যেন, ও মনে পড়েছে মনুসংহিতা। উঁচুবর্ণের মানুষের জীবনটীবন নিয়ে নাকি অনেক কথা বলে গেছে সে ওই বইতে। আর লিখেছে আমাদের কথা।' গুরুচরণ বলল।

'আমাদের কথাও লিখেছে সেই মুনি!'

'হ্যাঁ লিখেছে। তবে পোন্দে বাঁশ ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা।' ব্যঙ্গ মেশানো কণ্ঠে বলল গুরুচরণ।

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলল, 'আহা, তুমি অসভ্যতা করছ শিউচরণের বাপ। মুনি ঋষিদের সম্বন্ধে ও রকম করে বলতে নেই।'

'আসল কথা শুনলে তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা সব উড়ে যাবে কর্পূরের মতো। এই ঋষি যে আমাদের কী ক্ষতি করে গেছে শুনবে?' গুরুচরণের গলায় রাগের ঝাঁজ।

'কী ক্ষতি করেছে?' অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে।

'মনু তার বইতে লিখে গেছে—আমাদের মতো ছোটজাতদের শহরে বা ভদ্রমানুষদের কাছাকাছি বাস করার অধিকার নাই। আমরা নাকি থাকব শহর বা গ্রামের বাইরে। গাছের তলা, শ্মশানে, পাহাড়ে বা বন নাকি আমাদের বাস করার উপযুক্ত স্থান।' গুরুচরণ বলে।

'কিন্তু এখন তো আমরা শহরে থাকছি।' যুক্তি দাঁড় করায় অঞ্জলি।

গুরুচরণ হতাশ গলায় বলে, 'পাগলি! শহরে, কিন্তু শহরের কোথায়? শহরের এক কোঠায়, নদীর কাদা-প্যাঁকে ভরা পাড়ে।'

'ঠিক তো, এভাবে তো ভাবি নি কোনোদিন।' অঞ্জলি বলে।

গুরুচরণ আগের কথায় ফিরে যায়। বলে, 'ওই মুনি আরও তাজ্জব কথা লিখে গেছে। বাবাঠাকুর বলেছে—ওই মুনি নাকি লিখেছে ব্রাহ্মণের ঘর থাকবে পাঁচটা, ক্ষত্রিয়দের ঘর হবে চারটা। বৈশ্যরা তিনটা ঘর বাঁধতে পারবে। কিন্তু শূদ্রদের ঘরের সংখ্যা হবে দুইটা। ইচ্ছে করলে বা সামর্থ্য থাকলেও দুইটার বেশি ঘরের মালিক আমরা নাকি হতে পারব না।'

'কী আশ্চর্য!' অঞ্জলি বলে ওঠে।

'আমাদের কর্পোরেশনের বড় বড় সাহেবরা সবাই মুসলমান। হিন্দুধর্মের কোনো কিছুই মুসলমানরা মানে না। মনুষ্যজাতির এই বাজে বাজে কথাগুলো মুনসলমানদের মানার কথা না। তুমি ঠিকই বলেছ, কী আশ্চর্য, আমাদের ঘর বানাবার সময় তারা কিন্তু মনুর নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। মনুর লিখে যাওয়া নিয়ম মেনে কর্পোরেশনের বড় কর্তারা আমাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুটি ঘরই বরাদ্দ করেছে। একটি রান্নাঘর আর একটি শোবার ঘর।' কষ্টে গুরুচরণের কণ্ঠ বুজে আসে। অঞ্জলি চুপচাপ। গুরুচরণ অপেক্ষা করে অঞ্জলির কথার জন্য। কিন্তু অঞ্জলি কথা বলে না। গুরুচরণ অঞ্জলির বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় শুধু। একসময় গুরুচরণ জিজ্ঞেস করে, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি শিউর মা?'

'না। ঘুমিয়ে পড়ি নি। ভাবছি।' অঞ্জলি বলে।

'কী ভাবছ?'

'ভাবছি আমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে।'

গুরুচরণ বলে, 'তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে না—ঘরটি বানাবার জন্যই আজকে আমি চাকরিতে যাই নি কিনা? হ্যাঁ, ওই জন্যই আমি আজ কাজ করতে যাই নি। রামগোলামের মায়ের কথা শুনে কালকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারি নি। আমরা না হয় বুড়া হয়ে গেছি। কিন্তু শিউদের তো যৌবন আছে। তারা কেন বঞ্চিত হবে! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দক্ষিণ দিকের বারান্দাটির কথা মনে পড়ে গেল। তারপর কী করেছি তা তো দেখলে।'

'তো, আমাকে তো তুমি বলতে পারতে! আমিও চাকরিতে যেতাম না। তোমার সঙ্গে হাত লাগাতাম।' অঞ্জলি বলে।

'তাহলে আজ দুপুরের আনন্দটুকু পেতাম না। তোমরা সবাই তো অবাক হয়েছ। খুশিও হয়েছ সবাই। তোমাদের চোখ মুখ দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। সবচাইতে বেশি কে খুশি হয়েছে জান?'

'কে?' অঞ্জলির মুখে চাপা হাসি। ঘন অন্ধকারে সে হাসি চাপা পড়ে থাকে। গুরুচরণ বুঝতে পারে না সে হাসির মাহাত্ম্য।

গুরুচরণ বলে, 'সবচাইতে বেশি খুশি হয়েছে রামগোলামের মা, আমাদের শিউর বউ।'

'কেন?' এই প্রশ্নটি করবে করবে করেও করল না অঞ্জলি। এর উত্তর গুরুচরণ যেমন জানে, অঞ্জলিরও তা অজানা নয়। আহা বেচারি! আজ নিশ্চয়ই ছেলের সঙ্গে আনন্দে রাত কাটাচ্ছে।

কখন পুবাকাশে শুকতারা ভেসে উঠল, কখন ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণ বইতে শুরু করল, অন্ধকার কোটরিতে শুয়ে থাকা এই প্রাচীন দম্পতি টের পায় নি সে রাতে। শুধু শুনতে পেয়েছিল ফজরের আজানের সুমধুর ধ্বনি—

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।—

২

শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে রামগোলাম আজ তরুণ। এস.এস.সি পাস করার পর তার আর পড়া হলো না। গুরুচরণ ভাবল—আর পড়ার দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে। বিদ্যার পরিমাণে চাকরি পাবে না রামগোলাম। যতই পাস দিক, চাকরি তো একটাই—গু-মুত আর আবর্জনা সাফাই করা। ভদ্রলোকদের অফিসে চাকরি চাইতে গেলে রামগোলামকে চাকরি দেবে না। সে যে অস্পৃশ্য, ঘৃণার। মেথর সন্তান হিসেবে পরিচয় পেয়ে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেবে। বেশি বিদ্যা রামগোলামের জীবনে তখন কাল হয়ে দেখা দেবে। তখন রামগোলাম না পাবে অফিসে কোনো চাকরি, না করতে পারবে আবর্জনা-ময়লা টানার কাজ। তখন ওর জীবন কষ্টে ভরে যাবে। দরকার নেই আমাদের রামগোলামের জীবন কষ্টে ভরে যাবার। আর বেশি পড়ারও দরকার নেই। তার চেয়ে জমাদার আর বড়বাবুকে বলে রামগোলামের একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক ভালো হবে। আর মাস ছয়েক আছে গুরুচরণের চাকরি খতম হবার। এর মধ্যে যে করেই হোক রামগোলামের চাকরিটা যোগাড় করে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব গুরুচরণ ভেবে কূলকিনারা করতে পারছে না। আগে চাকরি পাওয়া খুব সহজ ছিল। পাকিস্তানি আমলে আজ চাকরি চাইলে তো আজকেই চাকরি পাওয়া যেত। স্বাধীনতার প্রথম দিকে বড় সাহেবের পেছনে দু'চার দিন ঘুরলে, জমাদারের পকেটে দু'চারশ টাকা গুঁজে দিলে চাকরি মিলত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, চাকরি পাওয়ার সংকট তত বাড়তে লাগল। প্রথম প্রথম মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জলদাসেরা, নাপিতেরা, ধোপারা রাস্তার আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ নিতে শুরু করল। তবে সেটা খুব বিপুল হারে নয়। শহরের অধিকাংশ ঘরে স্যানিটারি টাট্টিখানা চালু হয়ে গেলে এই কাজে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেড়ে গেল। টাট্টিকে মানুষ বড় ঘৃণা করে। তাই খোলা পায়খানা থেকে যারা টাট্টি টানত, তাদেরকেও ঘৃণা করত ভদ্র-শিক্ষিতজনেরা। শহরের অধিকাংশ জায়গায় টাট্টিটানা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এই কাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষেরা চট্টগ্রাম শহরে এসে জড়ো হতে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য, একটুখানি ঠাঁইয়ের জন্য যে-কোনো চাকরি করতে তারা রাজি। তাই কর্পোরেশনের হর্তাকর্তাদের ওপর চাপ বাড়ে। কর্পোরেশনের সাফাইয়ের কাজ পাবার অধিকার শুধু মেথরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে ন। বড়বাবু থেকে স্থানীয় রাজনীতিবিদ পর্যন্ত এই দাবি প্রসারিত হয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত কমিশনার, চেয়ারম্যানেরা নীতিনির্ধারকদের কাছে এই দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। বারবার দাবির মুখে কর্পোরেশনের নীতিনির্ধারকেরা ঠিক করে—কর্পোরেশনের ময়লা-আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ সবধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হলো। মেথরেরা এমনিতেই সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বিপন্ন মানুষ। এই আইন তাদেরকে অসহায়তার শেষ সীমায় পৌঁছে দিল। তারা জোটবদ্ধ হলো। চট্টগ্রামের চারটি মেথরপট্টির মানুষেরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরের দিকে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে বলল—আমরা এই কালাকানুন মানি না। এই চাকরি করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের আনা হয়েছিল এই দেশে। গু-মুত টেনে টেনে, নোংরা জায়গায় বসবাস করে করে ওরা জীবন কাবার করেছে। কই, তখন তো এ দেশের কোনো মানুষ এই চাকরি করতে চায় নি। আমরাই ঘৃণা সয়ে সয়ে, কষ্ট বুকে চেপে চেপে এই কাজ করে গেছি। আজ কেন অন্যজাতের মানুষেরা আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি করবে ? আর কর্পোরেশনের বড়বাবুরাই বা কেমন ? যুগ যুগ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে কর্পোরেশনকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি, আজ সেই কর্পোরেশন আমাদের পেটে লাথি মারল ? তা হতে দেব না। কিছুতেই আমাদের চাকরিতে ভাগ বসাতে দেব না।

কিন্তু বিশৃঙ্খল উত্তেজনা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। আগের মতো হরিজনদের সব আন্দোলন বিফলে যাবে। বাবাঠাকুর বলে দিয়েছে—মাথা ঠান্ডা রেখে এগুতে হবে। বড় সাহেবকে ছালামের সঙ্গে গুরুচরণকে কথা বলতে হবে। যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝাতে হবে—এ চাকরি শুধু তাদের জন্য, অন্যেরা এই কাজে ভাগ বসালে তারা স্রেফ পথের ভিখারি হবে। তাই করবে গুরুচরণ—ঠান্ডা মাথায় বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। প্রয়োজন হলে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। জুতায় কপাল ঘষতে ঘষতে বলবে—আমাদের অধিকার কেড়ে নিয়ো না বড়বাবু। নিজের সমাজের মানুষের জন্য এগুলো করতে তার শরম করবে না। কিন্তু বড় সাহেব কি শেষ পর্যন্ত তার কথা শুনবে ? ছালাম সাহেব উচ্চ শিক্ষিত, বর্তমানের জমাদার হারাধনবাবু বড় ধুরন্ধর। তাদের যুক্তির সামনে ধুরন্ধরতার সামনে সে কি দাঁড়াতে পারবে ? বয়স হয়ে গেছে তার। স্মৃতিশক্তিও সর্বদা সঠিকভাবে কাজ করে না। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলি, যদি তাদের কুযুক্তির সামনে ন্যায্য যুক্তি তুলে ধরতে না পারি, তাহলে তো সবকিছু ভেস্তে যাবে। এ ব্যাপারে কার্তিকের সঙ্গে কথা বলা ভালো। কার্তিকের মাথা গরম, কিন্তু হরিজনদের স্বার্থরক্ষার জন্য সে জান দিতে প্রস্তুত। ছালাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করার আগে এক বিকেলে ডাকিয়ে আনাল কার্তিককে। নাটমন্দিরের এক কোনায় বসল দুজনে।

'বলো জ্যাঠা, কী জন্য ডেকেছ আমাকে ?' গুরুচরণের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে কার্তিক।

পড়ন্ত বিকেল। চারদিকে ম্লান হলদে আলো। জ্যৈষ্ঠ মাস। গোটা দিন খর রোদ চড়িয়ে সূর্য যেন আলোশূন্য হয়ে পড়েছে। ক্লান্তও যেন সূর্যদেব। কোনোরকমে ঘরে যেতে পারলে বাঁচে। তাপদগ্ধ বাংলাদেশ, যেন এইবেলা বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। এই নদীপাড়, নদীপাড়ের লোকালয়, পিচঢালা রাস্তা, উঁচুনিচু চট্টগ্রামের নানা অলিগলি গরমে হাঁসফাঁস করছে। কর্ণফুলীর পাড়ের এই মেথরপট্টিও জ্যৈষ্ঠের খরতাপে বিপর্যস্ত। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে বিল্ডিংয়ের ছায়া এসে পড়েছে নাটমন্দিরে। মেথরপট্টির অন্যান্য অংশের তুলনায় নাটমন্দিরটি ছায়াশীতল। দেয়াল ঘেঁসে যে বড় আমগাছটি আছে, তার মাথায় অসংখ্য কাক ভিড় করছে। সারা দিন শহরের ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে উড়ে-ঘুরে খাবার যোগাড় করেছে তারা, মনোহরখালীর ফিসারিঘাটে দলবেঁধে পচা মাছ, মাছের নাড়িভুঁড়ি খেয়েছে, নদীপাড়ে মরাগরু ঠোকরেছে, রেয়াজউদ্দিন বাজারের কসাইখানার ওপর ঘুরে ঘুরে টুকরাটাকরা মাংসের ওপর ছোঁ মেরেছে, ঠোঁট ডুবিয়ে নালার রক্ত খেয়েছে, নাদান কাকগুলো কচি বাচ্চার

হাত থেকে বিস্কিট কেড়ে নিয়েছে। দিন শেষে ওই কাকগুলোর কেউ কেউ ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির এই বড় আমগাছটিতে আশ্রয় নিয়েছে। কত কথা তাদের মধ্যে। মায়ে ছেলে কথা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে, শ্বশুর-শাশুড়ি সেই ঝগড়া থামাতে চেষ্টা করছে, তরুণ-তরুণীরা ঝাঁকড়া গাছের মগডালে বসে চুপেচুপে হৃদয় বিনিময় করছে, ছোটরা এডালে ওডালে লুকোচুরি খেলছে আর সমানে চিৎকার করছে।

গুরুচরণ ওই কাকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আম গাছের ওই কাকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ কার্তিক।'

কার্তিক অবাক হয়ে একবার কাকদের দিকে আরেকবার গুরুচরণের দিকে তাকায়। বলে, 'কাকদের দিকে তাকাতে বলছ কেন ? ওদের দিকে তাকিয়ে কী হবে ? কেন ডেকেছ তাই বলো ?'

'কাকদের জীবন আর আমাদের জীবন সমান।' কাকদের ওপর চোখ রেখে গুরুচরণ বলল।

'মানে ? তোমার কথা বুঝতে পারছি না জ্যাঠা। খোলসা করে বলো।'

গুরুচরণ গামছা দিয়ে মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মুছে নেয়। কাকদের ওপর থেকে কার্তিকের দিকে মুখ ফেরায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, সকাল বেলা এই কাকগুলো উড়াল দেয়। উড়ে উড়ে খাবার খোঁজে। ওরা খায় কী ? আবর্জনা, ময়লা। মরা চিকার পেট ঠোকরায় এরা, গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়ি খায়। খেতে খেতে দিন শেষ হয়। আঁধার লাগতে লাগতে ফিরে আসে। ফিরে এসে আশ্রয় নেয় কোথায় ?'

কার্তিক জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ?'

গুরুচরণ বলে, 'কোথায় আবার। এই রকম বড় বড় গাছের ডালে। চট্টগ্রাম শহরে এখনো বড় গাছের অভাব নেই। দিন শেষে ওইসব গাছের ডালে ডালে আশ্রয় নেয় আর ঝগড়া করে।'

কার্তিক ভাবে—কাকের জীবন কাহিনী শোনাবার জন্য কি সর্দারজী এই ভ্যাপসা গরমের পড়ন্ত বিকেলে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে ? মনে হয় না। সর্দারের এত সময় কোথায় যে এরকম হালকা গল্পগুজবে সময় অপচয় করবে ? কাকদের নিয়ে এইসব কথাবার্তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কিছু লুকিয়ে আছে। এই ভেবে কার্তিক বিরক্ত হয় না। ধৈর্য ধরে

সর্দারের আসল কথার জন্য অপেক্ষা করে।

কার্তিক তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা, সেদিকে খেয়াল নেই গুরুচরণের। যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এমনি স্বরে আবার বলতে শুরু করে, 'আমরা আর কাকরা সমান। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ময়লা-আবর্জনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সকাল হলে আমরা কী করি ? কাঁটা, টুকরি, বেলচা-কোদাল নিয়ে ওই আবর্জনা সাফাইয়ে লেগে যাই। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা গু খায় কাকরা। আর আমরা সেই গু মাথায়, কাঁধে করে ছিপাতলির কুয়ার দিকে রওনা দিই। কাকদের সাথে আমাদের পার্থক্য আছে কি কোনো ?'

কার্তিকের মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। সর্দারের মতো করে ভাবে নি তো কোনোদিন সে। সর্দারের ভাবনা সত্যি। কাকেরা আবর্জনা খেয়ে খেয়ে শহর পরিষ্কার রাখে আর মেথরেরা ময়লা আবর্জনা মাথায়-কাঁধে বয়ে বয়ে শহরের রাস্তাঘাট, গলি-উপগলি, পাড়া-মহল্লা সাফ রাখে। তাহলে তো কাক আর মেথরদের মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই। ময়লা-আবর্জনার ব্যাপারটি ছাড়া আর কোনো কি মিল আছে ওদের সঙ্গে কাকদের ?

'আছে। আরেকটা ব্যাপারে মিল আছে।' সর্দার যেন কার্তিকের মনের কথা শুনতে পেল।

'কী মিল জ্যাঠা ?' কার্তিকের মুখ দিয়ে প্রশ্নটি বেরিয়ে এল। 'কাকদের কোনো ঘর নাই। বাসা বানাতে জানে না তারা। তাই ডালেডালে ঘুরে বেড়ায়। আমাদেরও কি ঘর আছে ? এক পরিবারে আমরা অনেক মানুষ। শোবার ঘর একটা। কাকদের মতো আমরাও একরকম বাস্তুহারা।' গুরুচরণ বলে।

কার্তিক বলে, 'তুমি ঠিক বলেছ জ্যাঠা। এই রকম আমি ভাবি নি কোনোদিন। তাইলে এক অর্থে আমরা কাউয়ার জাত।'

গুরুচরণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এতদিন তাই ছিলাম। কাউয়া সমান আমরা ছিলাম। এখন কাউয়ার চেয়েও এক ধাপ নিচে নেমে যাচ্ছি আমরা।'

'সে কেমন ?' কার্তিক জিজ্ঞেস করে।

'কাকেরা স্বাধীনভাবে খাবার যোগাড় করতে পারে। আমাদের খাবার যোগাড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের বড়বাবু আমাদের মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের গোষ্ঠীগত চাকরিতে ভাগ বসাচ্ছে। আমাদের চাকরি কেড়ে নেবার ব্যাপারটি পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। তাই বলছিলাম কাউয়াদের খাবার আছে, আমাদের থাকবে না। কাকদের চেয়েও অধম হয়ে পড়লাম আমরা।' গুরুচরণ বলল।

'ছালাম সাহেবের চালাকি সফল হতে দেব না আমরা।' তারপর প্রতিবাদী কণ্ঠ খাদে নামিয়ে কার্তিক বলল, 'তুমি আমাদের পথ দেখাও জ্যাঠা।'

গুরুচরণ বলে, 'ওই জন্যই তোমাকে ডেকেছি আমি। কালকে বড়বাবু ছালাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করব আমি। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে থাক। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সাহস পাব।'

কার্তিক বলে, 'কী বলছ তুমি জ্যাঠা ? তুমি আমাদের হরিজন সম্প্রদায়ের সাহস। তোমার শক্তিতে আমরা শক্তিমান। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন জ্যাঠা ?'

'দেখ, আমার বয়স হয়ে গেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি আর মনের জোর কমে এসেছে। স্মরণশক্তিতেও টান পড়েছে। ছালাম কী কথাতে কী কথা প্যাঁচিয়ে যদি আমাকে রাজি করে ফেলে। যদি আমি তার প্রস্তাবে হ্যাঁ বলে ফেলি! তাহলে গোটা মেথর জাতির কাছে আমি মীরজাফর হয়ে যাব।' গুরুচরণ বলে।

কার্তিক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তা কি তুমি করবে ? জান গেলেও তা তুমি করবে না। তোমার কাছে জানের চেয়েও জাতের স্বার্থ বড়।'

গুরুচরণ বলে, 'তা তো সত্যি। কিন্তু যদি আমাকে বুদ্ধির জালে আটকে ফেলে, তাহলে বিপদ।'

'ঠিক আছে জ্যাঠা, আমি তোমার সাঙ্গে যাব। কিন্তু কর্পোরেশনের সাহেবরা শিক্ষিত। বিদ্যার দোহাই দিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালাবে ওরা। আমি বলি কী...।' বলেই কার্তিক গুরুচরণের চোখের দিকে তাকাল।

গুরুচরণ মুখে কিছু বলল না। কিন্তু দুচোখে জিজ্ঞাসা—কী বলতে চায় কার্তিক। বামহাতের চেটো দিয়ে ন্যাকের মাথাটা ঘষতে ঘষতে কার্তিক বলল, 'রামগোলাম আমাদের সঙ্গে চলুক। পড়ালেখা জানে আমাদের রামগোলাম। ওরা কুযুক্তি দিলে ও তার উচিত জবাব দিতে পারবে। আর আমরা তো আছি।'

গুরুচরণ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। ডানে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তারপর স্পষ্ট গলায় কার্তিককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঠিক আছে। রাতে রামগোলামের সঙ্গে কথা বলব। রাজি করাব তাকে। তুমি কালকে দশটার দিকে কর্পোরেশনের মাঠে থাকবে। একসঙ্গে বড়বাবুর কাছে যাব।'

মা কালীর সামনে দণ্ডবৎ করে কার্তিক মাদারবাড়ী মেথরপট্টির দিকে এগিয়ে গেল। গুরুচরণ পা বাড়াল সর্দারজীর বিল্ডিংয়ের দিকে।

প্রায় এগারটা বাজে। এখনো গুরুচরণ আর কার্তিক এসে পৌছায় নি। রামগোলাম কর্পোরেশনের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে খোলামতন জায়গাটির দক্ষিণপাশে দেয়াল ঘেঁসে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি দাঁড়িয়ে আছে, তার ছায়ায় অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ। এই খোলা জায়গাটি আগে অনেক বড় ছিল। মূল বিল্ডিংটার দুদিকে তিনতলার আরও দুটো বিল্ডিং হওয়ায় খোলা জায়গাটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গুরুচরণদের যৌবন বয়সে এ স্থানটি অনেক খোলামেলা ছিল বলে হরিজনেরা একে কর্পোরেশনের মাঠ বলত। এখন স্থানটি অনেক ছোট হয়ে গেছে। এটা এখন মাঠ নয়, ছোট সিমেন্টে বাঁধানো বড় উঠান জাতীয় কিছু। তারপরও হরিজনেরা এখনো এটাকে কর্পোরেশনের মাঠ বলে। সেই মাঠের একপাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে তরুণ রামগোলাম মানুষজন দেখছে। গেইট দিয়ে কেউ ঢুকছে, কেউ বের হচ্ছে। কারো পায়ে তাড়া, কেউ ধীর পায়ে হাঁটছে। কারো চেহারা উদ্বিগ্নতায় ভরা, আবার কেউ কেউ হাসতে হাসতে যাতায়াত করছে। দু'চারটা কার এবং জিপ কর্পোরেশনের মূল বিল্ডিংয়ের মুখে এসে থামছে। ওসব গাড়ি থেকে বনেদিমুখো সাহেবরা নেমে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। রামগোলামের বুঝতে অসুবিধা হয় না—এরাই এই কর্পোরেশনের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এদের অঙ্গুলি হেলনে কর্পোরেশন উঠে আর বসে। এদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো আবদুস ছালাম—কর্পোরেশনের বড় বাবু। আবদুস ছালাম সাহেবের হাতে হরিজনদের ভবিষ্যৎ মরাবাঁচার নাটাই।

এস.এস.সি পাস করার পর দাদু আর বাপ মিলে যেদিন বলল—রামগোলাম, তোমার আর পড়ার দরকার নাই। রামগোলাম জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল—কেন পড়ার দরকার নাই ? কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগেই গুরুচরণ বলেছিল—আমরা ছোটজাত। ছোটজাতের লোকদের বেশি পড়তে নেই। বেশি পড়লে জীবনে বিড়ম্বনা বাড়ে শুধু। এই যে তুমি মেট্রিক পাস দিলে, কর্পোরেশনে তারও দাম পাবে না। এই পাস দিয়ে অন্য জাতের মানুষেরা যে চাকরি পাবে, তা তুমি পাবে না। কেন পাবে না ? পাবে না এজন্য যে তুমি মেথর। মেথরদের বেশি পড়তে নেই, বড় চাকরি পেতে নেই।

আর জোর করে তুমি বেশি পড়বে ? পড়। যতই পড় না কেন কর্পোরেশনের গু-মুত টানার আর নর্দমা সাফ করার আর রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার চাকরিই তোমার জন্য নির্ধারিত। তোমার আগে এই হরিজন পল্লীর কেউ সাহেবি চাকরি পায় নি, তোমার পরেও কেউ পাবে না। সুতরাং তুমি আর পড়ো না। অপেক্ষা করো, কর্পোরেশনের সাহেবদের হাতে পায়ে ধরে একটা চাকরি ব্যবস্থা করছি তোমার।

রামগোলাম সেদিন কিছু বলে নি। বলবার ভাষাও তার মুখে ছিল না। দাদু তো মিথ্যে বলে নি। এই শহরের চার চারটি মেথর পট্টি। কেউ তো সাফাইয়ের কাজ ছাড়া বড় কোনো কাজ করে না। অবশ্য তার মতো এত বেশি লেখাপড়া কেউ করেই নি। আগে করলে কী হতো ? বড় অফিসার হয়ে যেত ? দাদু বলেছে—কখনো না। মেথরের ছেলে মেথর। বাপ-দাদা যা করেছে ছেলে-নাতিকেও তা করতে হবে। কোনো মুক্তি নেই সমাজের এই শৃঙ্খল থেকে। কেন মুক্তি নেই ? তারা অচ্ছুৎ, তারা সমাজের আবর্জনা। আবর্জনাকে যেমন মানুষেরা বাড়ির এককোণে ফেলে রাখে, আবর্জনার দুর্গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য নাকে রুমাল চাপা দেয়, তারাও তেমনি সমাজের আবর্জনা, সমাজের এককোণে ঠাঁই তাদের, তাদের দেখলে ভদ্রলোকেরা এক পা দুই পা করে দ্রুত এগিয়ে যায়। এগুলো রামগোলামের ভাববার কথা না। কিন্তু যেদিন দাদু বলল, আমরা নিচু জাত, আমরা পাপোষ, সমাজে মাথা নিচু থাকবার জন্যই আমাদের জন্ম, লাথি ঝাঁটা খাওয়ার জন্যই আমাদের জীবন, সেদিন থেকেই রামগোলাম এসব ভাবতে শুরু করল। মেথর কারা, কোথা থেকে তারা এল, বাঙালি সমাজে তাদের অবস্থান কোথায়, তারা কেন শুধু গু-মুত টানার কাজ করবে, লেখাপড়া করার পরও কেন তারা ভালো চাকরি পাবে না, সমাজ-মানুষেরা কেন তাদের অস্পৃশ্য বলবে, কেন তাদের স্কুলটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কেন সে স্কুলে স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে মেথর সন্তানেরা পড়ালেখা করতে পারে না—এসব ভাবতে শুরু করল রামগোলাম। মা-বাবা দাদু কাজে বেরিয়ে পড়ার একটু পরে সেও বেরিয়ে পড়ে। পট্টি থেকে পট্টিতে ঘুরে বেড়ায় সে। ফিরিঙ্গিবাজার থেকে মাদারবাড়ী, মাদারবাড়ী থেকে ঝাউতলা আর ঝাউতলা থেকে ব্যান্ডেল মেথরপট্টিতে। বুড়োবুড়িরা রামগোলামের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ভাবে—পিচ্চি এই ছেলেটি কী কী সব জিজ্ঞাসা করে ? কী কী সব জানতে চায় ? মেথরদের প্রাচীন ও বর্তমান কাল সম্পর্কে কী কী সব জানতে চায় ? সর্দারের নাতি তো! অভাব নাই ঘরে। তাই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়—এ পট্টি থেকে ও পট্টিতে। প্রথম প্রথম বুড়োবুড়িরা রামগোলামকে হেলা-অবহেলা দেখালেও পরে রামগোলামের সহিষ্ণুতা দেখে, তার জানার আগ্রহ দেখে রামগোলামের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল। তাদের কাছ থেকেই রামগোলাম জানতে পারে—চট্টগ্রামে দুই ভাষাভাষীর ঝাড়ুদার সম্প্রদায় আছে। একটি তেলেগুভাষী অন্যটি হিন্দিভাষী। তেলেগুভাষীরা এসেছে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তম থেকে এবং হিন্দিভাষীরা এসেছে উত্তর প্রদেশের কানপুরের হাসিরবাগ থেকে। ব্রিটিশরাই তাদের এখানে নিয়ে আসে। ওই সময়ে ব্রিটিশ সরকার মেথরদের পর্যাপ্ত বেতন দিত। তাদের যাতায়াত ভাড়া ছিল ফ্রি, রেশনও পেত তারা। রামগোলাম এপট্টি-ওপট্টি ঘুরে বেড়ায় আর মেথরজীবনের এসব ইতিহাস শোনে। বুড়োবুড়িদের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। কারণ, তারাই জানে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস। তাদের কাছেই সে তার প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেয়। ওরা বলে—আমাদের বাপদাদারা কলকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে পাঁচ পাঁচবার ধর্মঘট করেছে, সে সাতচল্লিশের আগে। বেতন বাড়াবার জন্য এই ধর্মঘট ছিল। জমাদার, ঝাড়ুদার, মেথর ও আবর্জনা টানার গাড়ির গাড়োয়ানও এই ধর্মঘটে অংশ নেয়। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র তখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁর আগে মেয়র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর কাছে ধাঙরদের জনপ্রতি মাত্র দু'টাকা বাড়ানোর আবেদন ছিল। তিনি দেশনেতা ছিলেন। সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য চিত্তরঞ্জন কত সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু মেথরদের বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি সম্মতি দেন নি। চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু হতে পারেন মেথরবন্ধু তো নন। তাই ধাঙরদের আবেদন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দরবারে মাথাকুটে মরেছে। ধর্মঘটে গেল মেথররা। প্রথম দফায় ধর্মঘট ছয়দিন টিকেছিল। ধর্মঘটের কারণে চিত্তরঞ্জনের পরবর্তী মেয়র যতীন্দ্রমোহন এক টাকা বেতন বাড়াতে সম্মত হলেন; তাও জমাদারদের সাধারণ ধাঙরদের না। কিন্তু সেই সময়ের কলকাতা কর্পোরেশন যতীন্দ্রমোহনের এ সম্মতি মেনে নেয় নি। ওই সময় মেথরদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র বারো টাকা।

রামগোলাম জিজ্ঞেস করে—তারপর ? প্রাচীনরা বলে—ওই সময় ধাঙরদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান বেগম সকিনা। সকিনার পুরো নাম বেগম সকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জিদা। বাবা ইরানে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা। এই সকিনা কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন ১৯৪০ সালে। এই সময় বিভিন্ন দাবিতে মেথররা আবার ধর্মঘট করে। ব্যাপক ধরপাকড় ও দমনপীড়ন শুরু হয়; গুলিও চালানো হয় ধর্মঘটীদের ঘায়েল করার জন্য।

বেগম সকিনা কর্পোরেশনের নীতি-নির্ধারণী সভায় ধর্মঘটী ঝাড়ুদার-মেথরদের পক্ষে তুমুল বাকযুদ্ধ চালান, আবার বাইরে এসে ধর্মঘটীদের নেতৃত্ব দেন। আটদিন ধর্মঘট চলার পর কলকাতা কর্পোরেশন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। কর্পোরেশনের পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু মেথরদের মতো ছোটলোকদের দাবি মানে কে! কোনো দাবিই মানলেন না লোকমান্য সুভাষ বসু। ধাঙররা লৌহকঠিন ঐক্যে দাঁড়িয়ে থাকে। সুভাষচন্দ্রের জেদ মেথরদের দৃঢ় মনোবলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। যাদের বেতন ত্রিশ টাকা, তাদের মহার্ঘ্য এক টাকা করে বাড়বে—সম্মত হলেন সুভাষ বসু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হলো না কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা।

মেথরদের ধর্মঘটের এই বিচিত্র ইতিহাস রামগোলামকে অবাক করে, সে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়—চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন আর সুভাষ বসুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা শুনে।

প্রাচীনরা বলে— শুধু এদের ওয়াদাভঙ্গের কথা শুনে দুঃখিত হচ্ছ কেন ? দুঃখ পাবার আরও যে ব্যাপার আছে।

'সে কেমন ?' রামগোলাম চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে।

লোলচর্ম, বঞ্চিত-লাঞ্ছিত বুড়ো মেথররা বলে—ওয়াদাভঙ্গের কথা শুনে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট মেথর-ঝাড়ুদাররা আবার ধর্মঘট ডাকে। মুসলিম লীগের এ. আর. সিদ্দিকী তখন কর্পোরেশনের মেয়র আর সুভাষ বসু অন্যতম অন্ডারম্যান। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটের শুরু থেকে দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করে। ২৭ আগস্ট বেগম সকিনাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধাঙর বস্তিতে বস্তিতে পুলিশ ঢুকে ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ করে। ব্যাপক ধরপাকড়, নির্মম পুলিশি নির্যাতন আর নেতৃত্বহীনতার কারণে ধর্মঘটের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

তারপর ?

তারপ যে-কে সেই। আবার প্রতি সকালে গুয়ের টাঙ্গি মাথায় নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ ফুরানো, একঘরে ঠেলাঠেলি করে তিনপুরুষের জীবনযাপন, আবার ভদ্রলোকের লাথি-চড়, শালা-

বানচোদ, শুয়োরের বাচ্চা। টাঙ্গি টাঙ্গি মদ গিলে এসব যাতনাকে ভুলে থাকার চেষ্টা। তারপর মৃত্যু; তারপর আবার মৃত্যু।

এসব শুনে শুনে সেই অল্প বয়সে রামগোলাম পোক্ত হয়ে ওঠে। মেথর জীবনিতিহাসের অনেক কিছু জেনে যায় সে। তার ভেতর এক ধরনের অধিকার চেতনা দানা বাঁধে, স্বজাতের মানুষদের জন্য একটা দরদের জায়গা তার মধ্যে তৈরি হয়। মানুষের সৃষ্ট জাতপাতের প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা তার ভেতর উথালপাথাল করতে থাকে।

তাই গতরাতে দাদু গুরুচরণ যখন তাকে মেথরদের চাকরি-বঞ্চনার কথা বলল, তখন সে উত্তিজিত হলো। দাদু যখন তাকে সঙ্গে যাবার কথা বলল, সে এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

তুফান মেইল এখন ও টানে না, রাস্তার পাশের আবর্জনা টানে। ঘরে ঘরে স্যানিটারি পায়খানা হয়ে যাওয়ার ফলে বাড়ি বাড়ি থেকে গু-টানার প্রযোজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ তুফান মেইলের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। মোটা টিনের পাত লাগিয়ে তিনদিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ট্রাকটির। বর্তমানে তুফান মেইল স্বাভাবিক ট্রাকের রূপ নিয়েছে। আগের মতোই গুরুচরণ তুফান মেইল চালায়। যৌবন বয়সে তুফান মেইল তার হাতে এসেছিল, নেড়ে চেড়ে গুরুচরণ তুফান মেইলকে রংদার করে তুলেছিল। এখন গুরুচরণের মতোই ট্রাকটি বুড়ো হয়ে গেছে—লক্কড় ঝক্কড়। চলতে শুরু করলেই গরগর, ঝনঝনাৎ করে বাজে। দক্ষ হাতে ধীরে ধীরে চালায় গুরুচরণ। কোনো কিছুতে জোর ধাক্কা লাগলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার দশা তুফান মেইলের। জেলখানার মুখে, কোতোয়ালী থানার পাশে, বার্মা রাজু রেস্টুরেন্টের সামনে, দারোগা হাটের মুখে, রেয়াজউদ্দিন বাজারের ওভার ব্রিজের নিচে ইটের বড় বড় ডাস্টবিন তৈরি করে দিয়েছে কর্পোরেশন। নিকটবর্তী গলি-উপগলি থেকে, নর্দমা থেকে আবর্জনা ট্রলিতে করে এনে ওইসব ডাস্টবিনে ফেলা হয়। ওখান থেকেই ওগুলো তুফান মেইলে তোলা হয়। হালিশহরের ডাকাইত্যা বিল ভরাটের দায়িত্ব পেয়েছে কর্পোরেশন। ওখানেই তুফান মেইলকে নিয়ে যায় গুরুচরণ, আবর্জনামুক্ত হলে তুফান মেইলকে নিয়ে আসে শহরের ভেতরের আবর্জনায় ভরা ডাস্টবিনের কাছে। সব ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে হয় গুরুচরণকে। আজ কাজ শেষ করতে এগারটা বেজে গেল। জানে—কর্পোরেশনের মাঠে তার জন্য অপেক্ষা করছে রামগোলাম আর কার্তিক। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই, আবর্জনা পরিষ্কার করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ থেকে ছুটি নেই। দায়িত্ব পালনে একটু নড়চড় হলে অনেক খেসারত দিতে হয় তাদের—জমাদারের অশ্রাব্য গালিগালাজ, ছোটসাহেব বড় সাহেব নির্বিশেষে সবার চোখ রাঙানি। সঙ্গীদের তাড়া দেয় গুরুচরণ—'জ্যলদি, জ্যালদি, ট্রাকমে জ্যলদি ময়লা উঠাও।' সর্দারের আদেশে সঙ্গীরা দ্রুত হাত চালায়।

কার্তিকের ভাগ্য খারাপ আজ। কাজ পড়েছে অগ্রাবাদে। চট্টগ্রাম বেতারের আর.ডি-র পায়খানার টাঙ্গি জ্যাম হয়ে গেছে। টাঙ্গি পুরিয়ে গুয়ে-মুতে সয়লাব। আর.ডি সরকারি চাকুরে। কর্পোরেশনকে চিঠি দিয়েছেন—টাঙ্গির সমস্যা মিটান। ওই টাঙ্গি পরিষ্কার করার দায়িত্ব পড়েছে কার্তিক, রামলাল আর বড়বাবুর হাতেপায়ে ধরে চাকরি ফিরে পাওয়া মদো শ্যামলের। চাকরি জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ এই গুয়ের টাঙ্গি সাফ করা। দীর্ঘদিনের জমানো গু যে কী জঘন্য দুর্গন্ধময়, মেথররা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। টাঙ্গির ম্যানহোল খুললেই সেই দুর্গন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে মেথরদের নাকে-চোখে-মুখে-জিহ্বায়, সর্বাঙ্গে। গলা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়, নাকের কেশ জ্বলে ছাই হয়ে যেতে চায়, মাথা ঝিমঝিম করে, দুচোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে। বেদিশা হয়ে যায় তখন তারা। পালিয়ে বাঁচতে চায় তারা। কিন্তু পালাতে পারে না। পালালে যে চাকরি যাবে। চাকরি গেলে যে ভিখারি হতে হবে। ঘৃণাবোধ থেকে বাঁচার জন্য, বিবমিষা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাই তারা টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজে হাত দেওয়ার আগে মদ খায়, বাংলা মদ। মদ খেলে ভেতরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে, মনের মধ্যে বেশ একটা উড়ু উড়ু ভাব জাগে। যেন বাতাসে ভাসছে। আশপাশের সবকিছুকে তুচ্ছ বলে মনে হয়; নিজেকে অনেক বড়, অনেক মহান বলে মনে হয়, গুয়ের দুর্গন্ধকে মনে হয় গোলাপের সুবাস। তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন তারা। গু-মুত সাফাই করাকে কঠিন কাজ মনে হয় না তখন। টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজে হাত লাগাবার আগে লুঙ্গির প্যাঁচ থেকে মদের বোতলটি বের করে কার্তিকের দিকে এগিয়ে ধরে মদো শ্যামল। বলে, 'নে, নে কার্তিক, দু'চার ঢোক গিলে নে।'

কার্তিক বলে, 'আমি মদ খাব না আজ।'

'কেন খাবি না। তুই তো ধোয়া তুলসীপাতা না। এর আগে অনেকবার খেয়েছিস তো।' নিজের গলায় মদ ঢালতে ঢালতে শ্যামল বলে।

কার্তিক বলে, 'খেয়েছি। আজ খাব না।'

'কেন খাবি না। বউয়ের জন্মদিন নাকি? বউ গোস্‌সা করবে তাই?' বলেই হা হা করে হেসে ওঠে।

কার্তিক ঠান্ডা গলায় বলে, 'ঠিক তা-ই না। আজকে আমরা বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। তার সঙ্গে দরবার আছে আমাদের আজ। এসপার কি ওসপার।'

রামলাল শ্যামলের হাত থেকে এক ঝটকায় বোতলটি কেড়ে নেয়। শেষ ফোঁটাটি না-পড়া পর্যন্ত বোতলটি মুখের ওপর উপুড় করে রাখে। তারপর জড়ানো কণ্ঠে বলে, 'চল, কাজে হাত লাগাই।'

টাঙ্গি সাফ করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কার্তিক যখন কর্পোরেশনের মাঠে এসে পৌঁছাল, তখন ঘড়ির ছোট ও বড় কাঁটা দুটি বারোটা ছুঁই ছুঁই। দেখল—রামগোলাম আর গুরুচরণ আগেই উপস্থিত হয়েছে সেখানে।

কার্তিক বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে জ্যাঠা। টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজ ছিল। অনেক বড় টাঙ্গি, মালে ভর্তি। বালতি কেটে কেটে যত সাফ করি, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। আগ্রাবাদ থেকে অনেকটা দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে এসেছি আমি।'

গুরুচরণ বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিও তাড়াতাড়ি আসতে পারি নি। ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে অনেক আবর্জনা আজকে। হালিশহরে টানাটানি। কাজ শেষ করে আসতে আসতে বারোটা বেজে গেল।'

'রামগোলামেরই কষ্ট হলো বেশি। মাথাফাটা রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে।' দরদি কণ্ঠে বলল কার্তিক।

এই সময় ওরা দেখল—মূল বিল্ডিংয়ের গেইট দিয়ে ঝাউতলার মুখ্য যোগেশ বেরিয়ে আসছে। তার ডিউটি কর্পোরেশন অফিসে। বড় সাহেবের পেয়ারের লোক সে। ঝাড়ু দেওয়ার কাজ শেষ করার মুখে বড় সাহেব আবদুস ছালাম ডেকে পাঠালেন। দরজায় মুখটা গলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ওই বেডা, ভালো করে কামকাজ করছ না? চোখে সুরমা লাগাইয়া ঘুইরা বেড়াস বেডা?'

'জি হুজুর, কাজ করি তো, কিছুই বুঝতে পারছি,....।' আমতা আমতা করে বলেছিল যোগেশ।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছালাম সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছস না? এই তো! টয়লেট পরিষ্কার করছস আজ? বলবি—করছি তো স্যার। তাই না?'

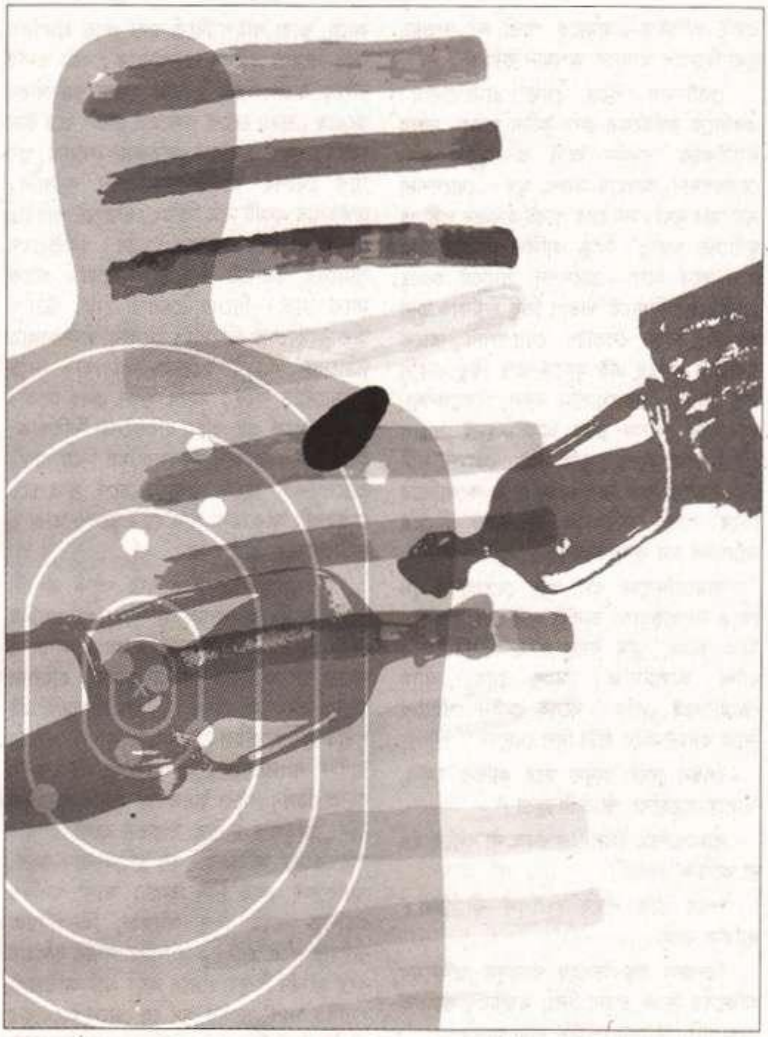

যোগেশ ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে। উপরে নিচে মাথা নাড়ে।

'দেখ, হারামির পুত দেখ, ভিতরে গিয়া দেখ। যদি সাফ করছ, তাইলে পায়খানা প্রস্রাব উপরে ভেসে উঠল কেমনে?' চোখ লাল করে কথাগুলো বললেন আবদুস ছালাম। কোঁতা হয়ে সামনে ডান হাত প্রসারিত করে বড়বাবুর পাশ দিয়ে টয়লেটে ঢুকল যোগেশ। দেখল— ইংলিশ টয়লেটের গর্তটি টইটুম্বর। গু-মুতে গলাগলি সেখানে। ঘটনা কী? সে তো সকালে হারপিক দিয়ে ডলে-মেজে টয়লেটটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তাহলে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে এই অবস্থা কেন? নিশ্চয়ই ইউসুফ মিয়ার কাজ এটি। বড় সাহেবের খাস পিয়ন সে। বড় সাহেবের আসার আগেই আসতে হয় তাকে। এসে টেবিল চেয়ার ঝেড়ে মুছে সাফ করে। দুইমণি ইউসুফ্যাই এই কাজ করেছে। সকালে বাসায় টাঙ্গি সাফ করে আসতে পারে নি বোধহয়। বড় সাহেবের টয়লেটেই আজ টাঙ্গি সাফ করেছে। কোনো একটা গড়বড় তো সে নিশ্চয়ই করেছে। যাই হোক, বড়বাবুর গালি শুনে পিত্তি জ্বলে গেছে তার। 'শালা, খানকির বাচ্চা' বলে বাম হাতটি আবাহু ডুবিয়ে দিল গু-মুতে ভরা টয়লেটে। নাক কুঁচকে, চোখ বন্ধ করে, মুখটা যতদূর সম্ভব ডানে ঘুরিয়ে শ্বাসবন্ধ করে কিছুক্ষণ হাতিয়ে গেল যোগেশ। তারপর 'পাইছি' বলে হাতটা উঠিয়ে আনল টয়লেট থেকে। হাতে টয়লেট পেপারের চাকা। জল লেগে টয়লেট পেপার ফুলে-ফেঁপে একাকার। টপাটপ পানি পড়ছে ওটা থেকে। ওটাই টয়লেটের পানি-ময়লা নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। 'শালার পুত ইউসুফ্যা, টয়লেট পেপার দিয়ে পোঁদ মুছতে গিয়ে গোটা প্যাকেটটা টয়লেটে ফেলছস। আর বড় সাহেবের কাছে দোষ দিছস আমার।' বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে এল যোগেশ। ছালাম সাহেবের সামনে কুঁজো হয়ে বলল, 'ঠিক হয়ে গেছে বড় সাহেব।'

'যা, আর কোনোদিন এরকম করিস না। তেরিসেরি করলে চাকরির বারোটা বাজাইয়া দিমু।' উষ্ণ গলায় বললেন ছালাম সাহেব।

ছালাম সাহেবের কাছে ধাতানি খেয়ে বেরিয়ে এল যোগেশ। বেরিয়েই গুরুচরণদের সঙ্গে দেখা। মনের বেদনা মুখে ভেসে উঠেছে যোগেশের।

গুরুচরণ বলল, 'যোগেশদা, এরকম চেহারা কেন তোমার? মরা মরা মানুষের মতো ফ্যাকাসে?'

'না, কিছু না দাদা।' নিচু স্বরে যোগেশ বলে।

'কিছু তো একটা হয়েছে। খোলসা করে বলো মেসো।' কার্তিক জিজ্ঞেস করল।

'বললাম তো কিছু হয় নি।'

কার্তিক বলল, 'কিন্তু চোখ মুখ যে বলছে কিছু একটা হয়েছে। গাট্টা খেয়েছ বোধহয় কারও কাছে।'

'না, বড় সাহেবের মন আজ ভালো নেই। একটু বকাঝকা করেছে এই আর কি।' বলল যোগেশ।

'তুমি তো উনার খাস দালাল। উনি তোমাকে বকলেন?' তীব্র কটাক্ষ কার্তিকের কণ্ঠে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছিল রামগোলাম। কিছু বলে নি। কার্তিকের কটাক্ষ তার ভালো লাগল না। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'থাক না কাকা, ঠাট্টা মশকরা আর নাইবা করলে।'

'তুমি চিন না আমার এই মেসোকে। বড়বাবুর এক নম্বর দালাল আমার এই মেসো। হরিজনদের যত সর্বনাশ হয়েছে, তার অধিকাংশের জন্য দায়ী এই যোগেশ মেসো।' কার্তিক চোখ রাঙিয়ে বলে।

অপমানটা গায়ে মাখল না যোগেশ। যেন কিছুই হয় নি এমনি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমরা কী জন্য জমায়েত হয়েছ এখানে?'

কার্তিক চোখ টিপার আগেই রামগোলাম গরগর করে বলে ফেলল, 'বড় সাহেব হরিজনদের ঠকাচ্ছেন। মেথরদের চাকরি দিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। এসপাড় ওসপাড় করতে এসেছি আমরা। তাঁর কাছেই যাব আমরা।'

যোগেশ চোখ বড় বড় করে বলল, 'ও, তাই নাকি ? চলো আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।'

'না তোমাকে যেতে হবে না আমাদের সঙ্গে।' হুংকার দিয়ে উঠল কার্তিক।

যোগেশ বলল, 'আমিও তো হরিজন। চাকরি অন্যদের দিয়ে দেওয়ার ফলে তোমাদের মতো আমারও ক্ষতি হবে। আমার ছেলে মেয়েরাও তো ঠকবে। বড় সাহেবের সঙ্গে তোমাদের যেমন প্রতিবাদ আছে, আমারও তেমনি প্রতিবাদ আছে। চল যাই, এক সঙ্গে যাই।'

কার্তিক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'বাঃ, বাঃ! কী সোন্দর ভাষণ। মীরজাফরের গলায় সিরাজদৌল্লার ডায়লগ!'

যোগেশ করুণ করুণ ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলল। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'তুমি যতই আমাকে তাচ্ছিল্য করো, একথা তো মানবে আমিও মেথর। ঝাউতলার মুখ্য আমি। ঝাউতলার মেথরপট্টির মানুষ ভালোবেসে আমাকে মুখ্য বানিয়েছে।'

'ভালোবেসে এবং ভরসা করে বানিয়েছিল। কিন্তু যোগেশদা, তুমি বিশ্বাস রাখতে পার নাই। কর্পোরেশন আর আমাদের ঝামেলার সময় তুমি অনেকবার কর্পোরেশনের পক্ষ নিয়েছ। তাতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে।' কোমর থেকে গামছাটা খুলে ঘাড়-গলা মুছতে মুছতে কথাগুলো বলল গুরুচরণ।

যোগেশ হাতেনাতে ধরাপড়া চোরের মতো মুখ কাঁচুমাঁচু করে বলল, 'আগে যা হয়েছে, হয়েছে। অতীত বাদ দাও সর্দার। এখন তো তোমাদের মতো আমারও ক্ষতি। বেইমানির প্রশ্ন আসে না।'

'যত কথাই তুমি বলো আমাদের সঙ্গে তোমাকে নেব না।' গর্জে উঠল কার্তিক।

যোগেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেল কার্তিকের উগ্রমূর্তি দেখে। কিছু একটা আশ্বাস পাওয়ার লোভে রামগোলামের দিকে তাকাল। ভাবল—সর্দারের নাতি রামগোলাম পেয়ারের বান্দা। কার্তিকও পছন্দ ও বিশ্বাস করে রামগোলামকে। নইলে এতবড় একটা ব্যাপারে রামগোলামকে সঙ্গে আনত না। শিক্ষিত ছেলে। রামগোলাম যদি তার পক্ষে কোনো মন্তব্য করে তাহলে তা ফেলতে পারবে না সর্দার আর কার্তিক। রামগোলামের মুখ দেখে মনে হচ্ছে—সে পুরোটা না হলেও তার কথা অনেকটা বিশ্বাস করেছে। বড় সাহেব আর এদের কথাবার্তার মধ্যে থাকতে হলে রামগোলামকেই ভিজাতে হবে। অসহায় দৃষ্টিতে রামগোলামের দিকে তাকিয়ে যোগেশ বলল, 'তোমার কী অভিমত রামগোলাম ? তোমারও কি একই অভিমত—আমাকে পাত্তা না দেওয়া, মুখ্য হিসেবে আমাকে অপমান করা ?'

দোটানায় পড়ে গেল রামগোলাম। একদিকে কার্তিকের রুক্ষ-কঠিন মন্তব্য, দাদুর কার্তিককে সমর্থন আর অন্যদিকে মুখ্য যোগেশদার অসহায়-করুণ মুখ। যোগেশদা সমাজের মুখ্য। সর্দারের পরেই হরিজন পল্লীতে মুখ্যদের গুরুত্ব। কিন্তু কার্তিক কাকার কথা শুনে মনে হলো—যোগেশদা সমাজে গুরুত্ব হারিয়েছে। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু কর্মকাণ্ড তার আছে। কিন্তু যেভাবে যোগেশদা তাকে মধ্যস্থতা মানছে এই মুহূর্তে তার কিছু একটা করা উচিত। রামগোলাম বলল, 'যোগেশদা, তুমি তো অনেক ক্লান্ত আজ। সেই সকাল থেকে কাজ করেছ। তুমি মুখ্য। তোমার দাম তো সমাজে কম না। এখন তুমি কলোনিতে ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তোমাকে নিয়েই আমাদের সব কাজ চলবে।'

রামগোলামের কথা শুনে যোগেশের মুখ থেকে নাছোড়বান্দা ভাবটা চলে গেল। বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ—আমি ফিরে যাচ্ছি কলোনিতে। মনে রেখ, আমি তোমাদেরই লোক।' বলেই মেইন গেইটের দিকে হনহন করে হাঁটা দিল যোগেশ।

পেছন থেকে অনুচ্চ স্বরে কার্তিক বলল, 'ছালাম সাহেবের পা-চাটা কুত্তা।'

রামগোলাম বলল, 'এ রকম না বললে হয় না কার্তিক কাকা!'

'পরে টের পাবে যোগেশ কী চিজ।' কার্তিক বলল।

তিনজন বড় সাহেব আবদুস ছালামের অফিসের দিকে রওনা দিল; গুরুচরণ কার্তিক পাশাপাশি, তাদের পেছনে রামগোলাম।

৩

রাস্তাটি চেরাগি পাহাড় থেকে ডিসি হিলের উত্তর পাশ দিয়ে লাভ লেইনের দিকে এগিয়ে গেছে। এই রাস্তাটির মাঝপেট থেকে একটা ঢালু রাস্তা নিচের দিকে নেমে গেছে পশ্চিমে। ঢালু রাস্তার পেট চিড়ে উত্তর-দক্ষিণে খালের মতন একটা বড় নালা। নালার দু'পাশে থকথকে কাদা। নানা আবর্জনা জঞ্জালে ভরা দু'পাড়। নালার পানি হলদেটে। অভিজ্ঞ মানুষেরা জানে তরল গুয়ের প্রবাহ এটি। নাই নাই করেও যাদের এখনো খাটা পায়খানা আছে, তারা পাইপ দিয়ে নালা পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছে তাদের পায়খানাকে। বর্জ্য পদার্থ নালার জলে মিশে ওরকম হলদে রঙ ধারণ করেছে। নালা থেকে কলজের বোঁটা ধরে টান দেওয়া দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে অবিরাম। নালার পূর্ব পাশ ঘেঁসেই ঝাউতলা হরিজন কলোনি। চারতলার একটি মাত্র বিল্ডিং। চল্লিশটি পরিবার গাদাগাদি করে থাকে এখানে। বিল্ডিংয়ের সামনের উঠানটি এবড়ো-থেবড়ো। মাঝে মাঝে গর্ত। দিনের বেলায় সেই উঠানে বাচ্চাকাচ্চাদের চ্যাঁ ব্যাঁ। শুকোর ছানাগুলোও উঠানের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করে। মানব বাচ্চা এবং শুকোর ছানা সম্পর্কে এই পট্টির হরিজনেরা নির্বিকার। মেয়েরা সংসার আর পুরুষেরা মদ নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রলোকেরা নাকে রুমাল চেপে দ্রুতপায়ে মেথরপট্টি আর নালা পার হয়। ভুলেও তারা ও দুটোর দিকে তাকায় না।

নিচতলার পাঁচ নম্বর ঘরে থাকে রূপালি দাশ। স্বামী ইন্দল্লাল দাশ। দাশ পদবিই লেখে এখন মেথররা। লালচাঁদের বাপ-দাদার নামের শেষে লেখা থাকত মেথর। হরিলাল মেথর, চমনলাল মেথর। ব্রিটিশ আমলেই এই পদবি চালু হয়েছিল। পাকিস্তান আমল পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথমদিকে এই পদবি বহাল ছিল। পরে হরিজনরা পদবি সচেতন হলো, কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব সচেতন হলো। পদবি পরিবর্তনের অধিকার পেল হরিজনরা। 'দাশ' পদবিকেই বেছে নিল তারা। 'দাস' পদবিও প্রচলিত আছে হিন্দু সমাজে, নিম্নবর্গীয়রা ব্যবহার করে এটি। আর 'দাশ' পদবি ব্যবহার করে বনেদি হিন্দুরা। মনে করে এটি অভিজাত পদবি। 'দাশ' শব্দের অর্থ যে জেলে অনেকের তা জানা নেই। মেথররা নামের শেষে মেথর শব্দটি বাদ দিয়ে 'দাশ' পদবিকে গ্রহণ করল। রূপালি মেথর এখন রূপালি দাশ, লালচাঁদ মেথর লালচাঁদ দাশ, ইন্দল্লাল মেথর ইন্দল্লাল দাশ। রূপালি রূপলালের একমাত্র মেয়ে। রূপলাল ঝাউতলা পট্টির বাসিন্দা। চাকরি সূত্রে সে দুই কামরার আবাসস্থলটি বরাদ্দ পেয়েছে কর্পোরেশন থেকে। বউ মারা যাবার পর আর বিয়ে করে নি রূপলাল। ছোট্ট মেয়েটি চোখের সামনেই বড় হয়ে গেল। মদতি ছিল রূপলাল। বউয়ের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। বউ মরার পর মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরল রূপলাল। ঝাউতলা থেকে ইন্দল্লালকে ঘরজামাই করে আনল। তার হাতে রূপালিকে গছিয়ে দিয়ে রূপলাল চোখ বুজল একদিন।

রূপালি চনমনে স্বভাবের। উজ্জ্বল শ্যামলা। মাঝারি উচ্চতা। ধারালো নাক। টানাটানা চোখ সবসময় কথা বলে। লম্বা ঘনকালো চুল খোঁপা করে বাঁধে।

সেজেগুজে থাকতে পছন্দ তার। সামাজিক চাপে হরিজনরা দিশেহারা। মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। উন্মূল তারা। ভদ্র শিক্ষিত সমাজের লোকদের যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে তারা। যা কিছু কথা নিজেদের মধ্যে। আনন্দ আর বেদনা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করেই তৃপ্ত তারা। কিন্তু রূপালির স্বভাব অন্যরকম। সে প্রতিবাদী। তার বাপ হাজার চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারে নি যে মেথরদের প্রতিবাদ করতে নেই। উপহাস-অবহেলাই তাদের ললাট লিখন। কিল-লাথি তাদের প্রাপ্য। ঠাট্টা-মসকরা-ঘৃণা তাদের বাড়তি পাওয়া। বাপ রূপলাল যতই বোঝাক কাজ কিছুই হয় নি। কোথাও অবহেলা-অসংগতি দেখলেই ফুঁসে ওঠে রূপালি।

রূপালি ধীরে ধীরে বালিকা থেকে তরুণী হয়ে উঠল। রূপলাল মদ ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে। চাকরি শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সে। মেয়েকে নিয়েই নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে রূপলাল। মেয়ে রান্না করলে তরকারি কুটে দেয় সে, ভাত খাবার পর বাসন কোসন মাজার জন্য পানি এগিয়ে দেয় মেয়ের দিকে। রূপলাল ভাবে—মেয়ে তার সেয়ানা হয়ে উঠেছে, বিয়ে দেওয়া দরকার। কিছু জমানো টাকা তার হাতে আছে। ওই টাকায় বিয়ে সেরে যাবে। কিন্তু মেয়েকে কাছছাড়া করা যাবে না। বউ নাই ঘরে তার। রূপালি অন্য ঘরে চলে গেলে একেবারে একা হয়ে যাবে সে। না, সে আর একা হতে চায় না। বউ তো প্রতিশোধ নিয়েছে। মরে গিয়ে অত্যাচারের জবাব দিয়ে গেছে তাকে। আর না। আর ভুল করবে না সে। ঘরজামাই এনে মেয়েকে কাছেই রেখে দেবে। ছেলে খুঁজতে থাকে সে। কখনো মনে মনে; কখনো আবার এপট্টি ওপট্টি ঘুরে ঘুরে। এ ঘরে ও ঘরে খোঁজ নেয় রূপলাল, বিয়ের যোগ্য চাকুরে ছেলে আছে কিনা?

ঘরে একা একা সময় কাটে রূপালির। পাড়া বেড়ানো স্বভাব না তার। অন্যদের ঘরে গিয়ে গালগপ্পো করতে পছন্দ করে না সে। দোতলার হরিলালের বউ আসে মাঝেমধ্যে। কর্পোরেশনে চাকরি করে সে। বিয়ে হয়েছে চার বছর। বাচ্চা হয় না। হরিলালের মা বলে—বাঁঝা বউ ঘরে এনেছি। একথা কানে তোলে না হরিলালের বউ কাজলি। কিন্তু একই কথা বলতে বলতে যেদিন শাশুড়িটা কাজলির জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তোলে, সেদিন কাজলি অনেকটা পালিয়ে আসে রূপালির ঘরে। এসে নীরবে চোখের জল ফেলে। রূপালি বলে, 'হরিলালদাকে বলো না কেন শাশুড়ির অত্যাচারের কথা?'

কাজলি বলে, 'সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আসে। তার মুখ দেখলে বড় মায়া হয়। মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি তাকে।'

'না বললে কি তুমি এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে? শাশুড়ি ছাড়বে না তোমাকে। শাশুড়ি তোমার জীবন কেড়ে নেবে।' রূপালি বলে।

'দেখি।' কাজলি কী যেন লুকাতে চাইছে। চোখ এড়ায় না রূপালির।

রূপালি চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'কী যেন লুকাতে চাইছ কাজলি বৌদি। গলার নিচে কী কথা যেন ঢোক গিলে চালান করছ?'

'না, না কিছু না।' ধরাপড়া চোরের মতো মুখ করে কাজলি।

'কিছু একটা তো বটেই।' তারপর কাজলির হাত ধরে বলে, 'কী সেটা বৌদি?'

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজলি। চুপচাপ খাটিয়ার কোনায় বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ মোছে। ডানে-বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে, 'প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে কাউকে বলব না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বড় কষ্ট পাচ্ছি বোন। এ কষ্ট আমার। আমার কষ্ট আমাকে থাক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু সেই কষ্টে যখন শাশুড়ি খোঁচা মারে, মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার।'

'কী ব্যাপার বলো তো বৌদি। এমন কী ঘটনা যা তুমি নিজের মধ্যে চেপে রেখেছ?' রূপালি কাজলির কাছ ঘেঁসে খাটিয়ায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে।

'প্রথম দু'বছর যখন বাচ্চা হলো না তোমার দাদা হাসতে হাসতে একদিন বলল—বিষয় কী? বাঁঝা নাকি তুমি? বাচ্চা হচ্ছে না কেন তোমার? এত বড় খোঁচার উত্তর দেই নি সেদিন। সাতদিন মতন চুপচাপ ছিলাম। তারপর একদিন রাতে বললাম—চল ডাক্তারের কাছে যাই। প্রথমে সে রাজি হয় নি। পরে চাপাচাপিতে রাজি হলো। গেলাম দুজনে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার আমাদের দুইজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। পরীক্ষা-টরীক্ষা, নানা রকম কাণ্ডকারখানা এই আর কি। সাতদিন পর রিপোর্ট দিল।' বলে থেমে গেল কাজলি।

রূপালি ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞেস করল, 'কী রিপোর্ট দিল ডাক্তারসাহাব?'

কাজলি বলল, 'তোমার দাদার বাচ্চা জন্ম দেবার ক্ষমতা নাই।' কাজলির কণ্ঠ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

'তো এই কথাটা শাশুড়িকে মুখের উপর সাফ বলে দাও না কেন?'

'কী করে বলি বলো? শাশুড়ি কী পরিমাণ দুঃখ পাবে ভেবে দেখেছ? তা ছাড়া, তোমার দাদার সম্মান? পট্টির মানুষেরা তোমার দাদাকে নিয়ে ঠাট্টা মসকরা শুরু করবে। তার জীবনটা অপমানে ভরে যাবে।' কাজলি বলে।

হা করে তাকিয়ে থাকে রূপালি কাজলির মুখের দিকে। ভাবে—বলে কি কাজলি বৌদি? সারা জীবন কি এভাবে কষ্ট পেতে থাকবে নাকি? তারপর আবার ভাবে—তার কাছে কাজলি বৌদি মনের ব্যথা বুঝিয়ে যদি একটু শান্তি পায়, পাক না। তারপর দরদ মেশানো কণ্ঠে বলে, 'তুমি অনেক ভালো বৌদি। স্বামীর সম্মান নিয়ে তুমি এরকম করে ভাব? ভাবতেও বড় ভালো লাগছে। দাদা তো তোমাকে আদর যত্ন করে। শাশুড়ি আর কতদিন বাঁচবে। তখন সংসার সুখে ভরে যাবে তোমার।'

কাজলি মনে সুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে।

চারতলার মনুলালের শালা জনি আড়েঠাড়ে তাকায় রূপালির দিকে। সুযোগ পেলে গা ঘেঁসে হাঁটে। ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোয় তার গা থেকে। বাহারি রুমাল গলায় বাঁধে। লুঙ্গিটা বাম হাতে গোছা করে তুলে ধরে হাঁটে। ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছে বোনাইয়ের বাড়িতে। অনেকদিন কেটে গেল তারপরও যায় না। দিনে এখানে ওখানে ঘুরে, রাতে মদের ঠেকে আড্ডা দেয়। গভীর রাতে মাতাল হয়ে পট্টিতে ফেরে। রূপালিদের ঘর ঘেঁসেই উপরে উঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির দিকে জানালা। জানালা বন্ধ থাকে সর্বদা। ওই জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আওয়াজ ঢোকে অনায়াসে। প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই জনি মাতাল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—

আজি ধনী কেন, কেন অধোবদনে।
কথায় কথায় অভিমান প্রাণে বাঁচিনে ॥
দিয়ে দোষ করেছ মান, বসনে ঢেকে বয়ান,
নিরাসনে বসে আছ আদরিণী প্রাণ,
মান ত্যজ ও সুন্দরী, আমি তোমার করে ধরি,
তোমা বিনে অন্য নারী, না হেরি নয়নে ॥

ঘরের ভেতরে রূপলাল গর্জে ওঠে, 'খানকির পোলা। বেহেনচোদ শুয়োর কা লেড়কা।'

রূপালি বলে, 'চুপ থাক বাবা। কুত্তাকে হাড্ডি চিবাতে দাও। মেজাজ গরম করো না। তোমার রূপালির কোনো লোকসান করতে পারবে না ওই হারামি।'

জনির বাবা কোনো কন্ট্রাকটরের নেকনজরে পড়ে দু'পয়সা কামিয়েছে। জাতে উঠেছে। পট্টি ছেড়ে জাত লুকিয়ে সাভারের দিকে বাড়ি করেছে। ওখানে জনি মাস্তানদের সঙ্গে জড়িয়েছে। পট্টির

লোকেরা বলে, 'কী একটা খুনটুনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নাকি জনি। ওখান থেকে পালিয়ে এই ঝাউতলার মেথরপট্টিতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কোনো ভয়ের ছাপ জনির চেহারায় লক্ষ করা যায় না। গায়ে দিব্যি হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। পট্টির কাউকে সে তোয়াক্কা করে না। তার বোনাই মনুলাল এই পট্টির দুজন মুখ্যের একজন। এই জনির নজর পড়েছে রূপালির ওপর। রূপালিকে সে চিনে উঠতে পারে নি।

একদিন চোখাচোখি হতেই চোখ টিপেছে জনি। সে চোখে কাম। রূপালি তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দিল চনমন করে ? ধরফড়ায় বুক ?'

জনির মুখে ঝিরঝিরে হাসি। কাছে এগিয়ে গিয়ে রূপালি তর্জনী তোলে জনির দিকে। বলে, 'ওই নালা দেখেছ ? গু মিশানো পানি সেখানে। মুখটা চাইপা ধরব ওই পানিতে।' রূপালির চোখে আগুন। থতমত খেয়ে যায় জনি। সটকে পড়ে রূপালির সামনে থেকে। কিন্তু জনি ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না। সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। সে গান পাল্টায়—

সহে না সহে না সখি, দুরন্ত বসন্ত জ্বালা।
চল সখি কুল ত্যজি, অকূলে দিই প্রেমমালা।
বিলায়ে যৌবন ডালা, ঘুচাব মনের জ্বালা,
করিব আজ প্রেম খেলা, প্রেম তুফানে ভাসিয়ে ভেলা ॥

জনির অত্যাচারে রূপলাল অসহায় বোধ করে। কী করবে, কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না। চাকরিতে তার মন টিকে না। মন পড়ে থাকে ঘরে। মনের ভেতর কু-ডাক শুনতে পায় রূপলাল। যেনতেনভাবে কাজ শেষ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফেরে। মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। রূপালির মধ্যে অপমানের চিহ্ন খোঁজে। বাপের অসহায়তা আর উদ্বিগ্নতা টের পায় রূপালি। বাপকে বলে, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন বাপ ? তোমার মেয়ের নাম রূপালি। কেটে ওই গু-মুতের নালায় ভাসিয়ে দেব।' রূপলাল আশ্বস্ত হতে পারে না। দিশেহারা রূপলাল। সর্দারজীর কাছে যাবে ? জমাদারকে বোঝাবে ? পট্টির মানুষদের ডেকে একত্রিত করবে ? তাতে দুর্নাম হবে রূপালির। মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে। তখন বড় বিপদে পড়ে যাবে রূপলাল। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একদিন যোগেশের সঙ্গে দেখা করে রূপলাল। যোগেশ ঝাউতলা মেথরপট্টির মুখ্য। তাকে জনির অত্যাচারের কথা বোঝালে হয়তো একটা সুরাহা হবে। রূপলাল জানে—যোগেশের চাকরি কর্পোরেশনের মেইন অফিসে। সেখানেই এক দুপুরে রূপলাল উপস্থিত হয়। বলে, 'যোগেশদা, বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।' তারপর ধীরে ধীরে সব ঘটনা বলে যায় রূপলাল—জনির বিশ্রী গান গাওয়ার কথা, মেয়ে রূপালির প্রতি অশ্লীল আচরণের কথা, সর্বোপরি জনি যে এই পট্টির কেউ নয়, সেকথাও বলতে ভুলে গেল না রূপলাল। শেষে বলল, 'তুমি পট্টির মুখ্য যোগেশদা, এ পাড়ার ভালোমন্দ দেখা তোমার কাজ।'

মনুলালের সঙ্গে যোগেশের খুব খাতির। দুজনেই মুখ্য। প্রতি সন্ধেয় মদের ভাটিতে এক টেবিলে বসে দুজনে। শ্বশুরের আশীর্বাদে মনুর হাতে ভালো টাকা। টাকার ঝনঝনানিতে মুগ্ধ যোগেশ। রূপলালের আর্জিতে মুচকি হাসে যোগেশ। ধুতির গোছা নেড়েচেড়ে পেছনে গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'দেখ রূপলাল, নিজের মেয়েকে একটু ঠিকঠাক করে রাখ। মা নাই ঘরে। কখন কী করে তার কোনো ঠিকানা আছে ? আর মনুলালের শালার কথা বলছ, দেখি মনুলালের সঙ্গে কথা বলে, কী করা যায়।'

হতবাক হয়ে রামলাল তাকিয়ে থাকে যোগেশের দিকে। কোথায় তাকে আশ্বস্ত করবে, তা না উল্টো আকারে ইঙ্গিতে মেয়ের দোষ গাইছে। বলে কিনা—মেয়েকে ঠিকঠাক করে রাখবে। তার মেয়ে বেঠিকভাবে চলে—এটাই কি বলতে চাইছে যোগেশ ? মেয়ের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রূপলালের। রূপালি প্রতিবাদী, ফটাফট মুখের ওপর কথা বলে ফেলে—এটা সত্যি। কিন্তু মেয়ে যে তার বেচাল চলে না—একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে রূপলাল।

'তুমি কি আমার মেয়েকে দোষ দিচ্ছ দাদা ?' একটু উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে রূপলাল।

যোগেশ বলে, 'সে রকম তো বলি নি আমি। শুধু বলেছি—মেয়েকে একটু দেখে শুনে রাখতে।'

'দেখে শুনে মানে ? কী বলতে চাও তুমি যোগেশদা ?' রূপলাল জিজ্ঞেস করে।

'আহা! তুমি ভুল বুঝছ কেন রূপলাল। আমি খারাপ কিছু ইঙ্গিত করছি না।' যোগেশ বলে।

যা বোঝার তা রূপলাল বুঝে ফেলে। ঝট করে বসা থেকে উঠে পড়ে। কোমরের গামছা খুলে হাওয়ায় একটা ঝাটকা মারে। তারপর হনহন করে গেইটের দিকে হাঁটা মারে রূপলাল। পেছন থেকে শুনতে পায় যোগেশ উঁচুগলায় বলছে, 'তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দাও রূপলাল। পট্টির মানুষদের একবেলা ভালো করে খাওয়াও...।' আরও কী কী যেন বলল যোগেশ, দূরে চলে আসার কারণে শেষের কথাগুলো শুনতে পেল না রূপলাল।

সে রাতেই রূপালির ঘরে ঢুকল জনি। বার্ষিক মহোৎসবের প্রস্তুতিমূলক সভা বসেছিল বান্ডেলে। বান্ডেল পট্টির সামনে বড় উঠান। ওখানেই বার্ষিক মহোৎসব হয়। সর্দার গুরুচরণের ঘর ফিরিঙ্গিবাজার হলেও বান্ডেলেই সভা ডেকেছে সে। চার পল্লীর সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে সভায় উপস্থিত হতে। অন্যান্যদের সঙ্গে সে সন্ধেয় রূপলালও উপস্থিত থেকেছে সভায়। সভা ভাঙতে ভাঙতে রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। ঝাউতলার পট্টি প্রায় পুরুষশূন্য। মেয়েরা শিশুদের নিয়ে দরজায় দরজায় খিল তুলেছে। রূপালি দরজাকে সামান্য ফাঁক করে বাপের পথের দিকে চেয়ে ছিল। অপেক্ষা করতে করতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন লেগেছিল। ওই সময় দরজা ঠেলে ঘুরে ঢুকে পড়ল জনি।

মিনিট তিনেকের মধ্যে 'ও মারে বাবারে, মরলাম রে, বলতে বলতে দ্রুত রূপালির ঘর থেকে বেরিয়ে এল জনি। পরদিন সকালে সবাই দেখল—জনির ডান হাতের তালুতে ব্যান্ডেজ। বঁটির কোপে দু'ফালা হয়ে গেছে তালু। গলার বাহারি রুমাল ডান হাতের তালুতে জড়ানো।

ওই সন্ধ্যায় সালিশ বসল ঝাউতলার পট্টিতে। চারটা পট্টি থেকে মুখ্যরা এল, গণ্যমান্যরা এল। জবানবন্দী নেওয়া হলো দুজনের। নিচতলার অন্যান্য ঘরের নারীরা জনির বেলেল্লেপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। দোষী সাব্যস্ত হলো জনি। সবাই সর্দারের দিকে তাকাল। গম্ভীরমুখো গুরুচরণ বলল, 'শাস্তি পেতে হবে জনিকে। মুখ্যের শালা হলেও রেহাই নেই। জঘন্য অপরাধ। মাথা মুড়িয়ে দাও। আগামী সকালে যাতে জনিকে এই পট্টিতে দেখা না যায়।'

কুমারী মেয়ের সতীত্বহানির চেষ্টা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সর্দারের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। মনুলাল মাথা নিচু করে রইল। সে জানে—প্রতিবাদ করলে আরও বড় শাস্তি তার মাথার ওপর নেমে আসবে। একঘরে করা হবে তাকে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তখন। তা ছাড়া প্রতিবাদ করবে কার জন্য ? ওই হারামজাদা জনির জন্য ? কুত্তার বাচ্চা হারামি, কী একটা লটঘট বাঁধিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছে। এখানে পালিয়ে

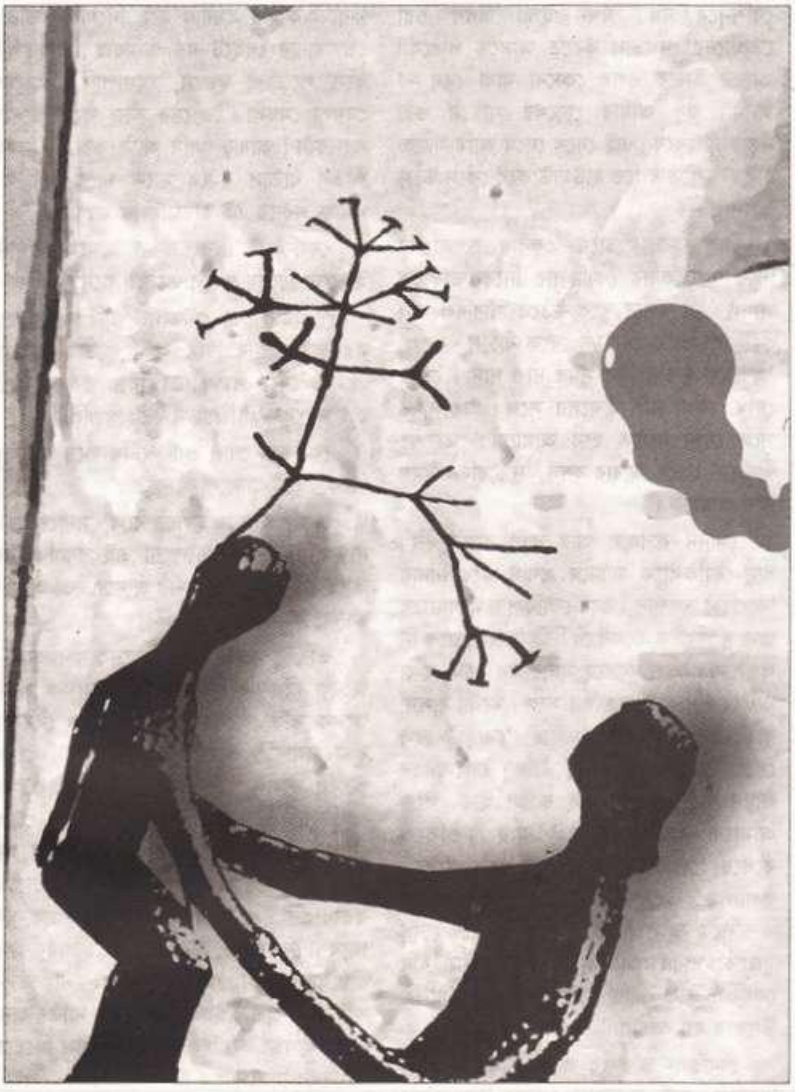

এসেও সোজা হয় নি। মুখ পোড়ালো আমার। সমাজের সামনে মাথা হেট করাল। হঠাৎ মনুলাল চিৎকার করে উঠল, 'রূপলালের মেয়ে চনুটা কেটে নিল না কেন হারামজাদার ?' তারপর কণ্ঠটাকে একটু নিচু করে বলল, 'সর্দারের বিচারের ওপর কথা নেই। মাথা চেঁছে দেওয়া হোক হারামখোরের।'

সর্দার গুরুচরণের রায় কার্যকর হলো সেই সভাতেই। বিচার সভা ভাঙার মুখে রূপলালকে উদ্দেশ করে গুরুচরণ বলল, 'তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দাও রূপলাল।'

হরিজন সমাজ পুরুষশাসিত। সেই সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি হলো সর্দার। মুখ্যরা তার পরামর্শক। সহায়ক শক্তিও। নারীরা এই সমাজে সত্যিই অবলা। দুর্বল অর্থে যেমন, নির্বাক অর্থেও তেমনি। নারীদের বাসনার তেমন কোনো বাস্তবায়ন হয় না এ সমাজে। প্রয়োজনবোধ করলে পুরুষেরা নারীদের পরামর্শ নেয়, তবে সেই পরামর্শের বাস্তবায়ন পুরুষদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। বহু বহু কাল আগে থেকে হরিজন নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয়। উপার্জনও করে তারা। কিন্তু এই উপার্জনে হাত বাড়ায় পুরুষেরা। পুরুষেরা মানে স্বামীরা। মদ-জুয়া আর দেনায় ডুবে আছে পুরুষ মেথররা। ফলে স্ত্রীর আয়ে থাবা দেয় ওরা। কিন্তু নারীরা সংসারমুখী, সন্তানের সুখ-দুঃখ আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তারা ভয়ার্ত থাকে। সাবধানে খরচ করে নিজের আয়। কিন্তু কাবুলিওয়ালার মতো পুরুষেরা নারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাড়ে অশান্তি। নির্যাতিত হয় বিবাহিত নারীরা। ঝগড়াঝাটি, মারামারি ইত্যাদিতে মুখর থাকে প্রায় প্রতিটি পরিবার। পরিবারে অশান্তি আর অভাব যাই থাকুক না কেন, কুমারী মেয়েদের ব্যাপারে মেথর সমাজ খুবই সতর্ক এবং সন্দেহশীল। প্রতিটি কুমারী মেয়ে মেথর সমাজের এক একটি দামি মুক্তা। এই মুক্তার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ তাদের শারীরিক পবিত্রতা। এই পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়াকে তারা জঘন্য অপরাধ মনে করে। কিন্তু সমাজে মাঝে মধ্যে এই অপরাধ যে সংঘটিত হয় না, তেমন নয়। এক্ষেত্রে মেয়ে-ছেলে দুজনেই অবিবাহিত হলে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সমাজে এই ব্যাপারে জোরাজুরির কোনো স্থান নেই। কোনো পুরুষ যদি জোর করে কোনো নারীর দিকে লালসার হাত বাড়ায় এবং নারী তা প্রত্যাখ্যান করে আর ব্যাপারটি সম্বন্ধে জানাজানি হয়ে যায়, তখন খরতর খড়্গ নেমে আসে পুরুষটির ঘাড়ে। রূপালির ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

কিন্তু গুরুচরণের মনে হয়েছে—রূপালি মেয়েটির মা নেই, বাপ অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে থাকে। তাই রূপালির যত শিগগির সম্ভব বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। স্বামীই তার ভবিষ্য নিরাপত্তা বিধান করবে। গুরুচরণের কথায় রূপলাল পরদিন থেকেই মরিয়া হয়ে উঠল। শেষমেশ সে খুঁজে পেল বাল্লুর শালিকার ছেলেকে। ইন্দল্‌লাল। জন্ম দেওয়ার পরপরই ইন্দল্‌লালের মা মারা যায়। বাপ ছিল পাড় মাতাল। মত্ত অবস্থায় টাট্টিখানার টাঙ্গি সাফ করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তখন ইন্দলের বয়স চার বছর। বাল্লুর স্ত্রী, সন্তানহীন কোকিলা ইন্দলকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। সেই থেকে আজ অবধি ইন্দল বাল্লু-কোকিলার সঙ্গে থাকে। ইন্দল্‌লাল এখন বিয়ের যোগ্য। রূপলাল প্রস্তাব নিয়ে গেলে বাল্লু এক কথায় রাজি হয়ে যায়। কিন্তু রূপলাল যখন ঘরজামাইয়ের প্রস্তাব দেয়, কোকিলা বেঁকে বসে। পুত্রহীনা এই নারীটি ইন্দলকে পাওয়ার পর থেকে এই বাসনা নিজের মধ্যে লালন করে এসেছে যে একদিন ইন্দলের বউ ঘরে আসবে। সেই বউকে নিয়ে অঞ্জলি দিদির মতন সংসার সাজাবে। নাতি-পোতারা তার চারদিকে কিলবিল করবে। ইন্দল, তার বউ, তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে সে পুত্রহারানোর হাহাকারকে ভুলে থাকবে। আজ রূপলাল এসেছে সেই বাসনায় হিমশীতল জল ঢেলে দিতে ? তা হবে না, তা হতে দেবে না কোকিলা।

কোকিলা বলে, 'তোমার প্রস্তাব আমি

মানতে পারলাম না রূপলাল। তোমার মেয়ে সুন্দরী একথা মানি। কিন্তু ছেলে আমার তোমার ঘরে চলে যাবে, তা হবে না।

'দেখ দিদি, আমার ঘরে বউ নেই, রূপালি ছাড়া অন্য কোনো সন্তান নেই। মেয়ে আমার তোমার ঘরে চলে এলে আমার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ ? রান্না করার কেউ থাকবে না, কথা বলার কেউ থাকবে না। আমার কষ্টটা একটু বুঝবার চেষ্টা করো দিদি।' অনুনয়ের সুরে কথাগুলো বলে রূপলাল।

কোকিলা কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'তুমি তোমার দিকটা বললে, আমাদের দুজনের দিকটা ভেবে দেখেছ দাদা। ছেলেটি গাড়িচাপা পড়ে মারা গেল। পরে আমাদের কোনো সন্তান হলো না। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এই লোকটি আমাকে বুকের বাঁধনে জড়িয়ে রেখেছিল সেদিন।'

পাশে বসা বাল্লু বলে উঠল, 'থাক না কোকিলা, ফেলে আসা কষ্টের কথা আজ আর নাইবা বললে।'

'আমাকে আজকে একটু বলতে দাও। বোনের ছেলেটাকে পেয়ে আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। সর্দারজীর বউ অঞ্জলিদি সে সময় আমাকে কত সান্ত্বনা দিয়েছে। ইন্দল বড় হলো। আমি আর ও নিজের ছেলের মতন ইন্দলকে বুকে টেনে নিলাম।' বলল কোকিলা।

রূপলাল চুপসে যায়। কী করবে এখন সে? ঘরে তরুণী যৌবনবতী কন্যা। অরক্ষিত। মেয়ে বাল্লুদের ঘরে চলে এলে একাকিত্ব তাকে গ্রাস করবে। একদিকে মেয়ের নিরাপত্তা, অন্যদিকে নিজের একাকিত্ব ও অসহায়তা। কোনটাকে বেছে নেবে ঠিক করতে পারে না রূপলাল। তা ছাড়া মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে এলে আর সে মারা গেলে ঘরটি কর্পোরেশন নিয়ে নেবে। টাকা খেয়ে জমাদার ও তার তাঁবেদাররা অন্যজনকে বরাদ্দ দিয়ে দেবে ঘরটি। মেথর যে সে-ঘরের বরাদ্দ পাবে তা নয়। কোনো জলদাস, বা হাঁড়ি বা নিচু জাতের হিন্দু ঘুষ দিয়ে এই ঘরের মালিক হবে। ওরা মেথরদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নেবে ঘর। তা হবে না, তা হতে দেবে না রূপলাল। রূপলাল এবার বাল্লুকে উদ্দেশ করে বলল, 'দেখ বাল্লুদা, সরকার আমাদের জন্য মাত্র দুইটা ঘর বরাদ্দ দিয়েছে, রান্নাঘর আর একটা থাকার ঘর। দেখে আসছি—ছেলের বিয়ে দিয়ে মা-বাপ রান্নাঘরে ঢুকে। ইন্দলকে বিয়ে করালে তোমাদেরও একই দশা হবে। আমি একা মানুষ। মেয়ে-জামাই শোবার ঘরে থাকবে। আমি এখানে ওখানে রাত কাটিয়ে দিতে পারব। আমার মরার পর ওই ঘরের মালিক হবে রূপালি অর্থাৎ ইন্দল। তা ছাড়া, ঝাউতলা থেকে বাল্ডেল বেশিদূরে নয়। যখন ইচ্ছা তখন ওরা তোমাদের দেখভাল করতে আসতে পারবে। তাদের ইচ্ছার ওপর কোনো বাধা দেব না আমি। শুধু আমার চোখের সামনে ওরা নড়াচড়া করবে। এই দেখে দেখে আমি মরতে চাই।' বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল রূপলাল।

বাল্লু করুণ চোখে একবার রূপলালের দিকে আরেকবার কোকিলার দিকে তাকাতে লাগল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কোকিলা তাকে দোটানা থেকে বাঁচাল। বলল, 'আমাকে দু'চার দিন সময় দাও দাদা। ভেবে দেখি। কথা বলি ইন্দলের সঙ্গে। অঞ্জলিদির সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'দু'চারদিন সময় দাও আমাকে।'

সেদিন রূপলাল আর কথা বাড়ায় নি। বাল্লু-কোকিলাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিল রূপলাল। তবে কোকিলার মতামতের জন্য দু'চারদিন একেবারে নিষ্ক্রিয় বসে থাকে নি রূপলাল। দেখা করেছে সর্দারজীর সঙ্গে, কথা বলেছে সর্দার স্ত্রী অঞ্জলির সঙ্গে। মনের বাসনা বুঝিয়েছে তাদেরকে। বলেছে, 'মেয়েটি চলে গেলে বড় একা হয়ে যাব আমি। একা-জীবন ভীষণ কষ্টের। তুমি এই কষ্টের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও সর্দার।' আর অঞ্জলিকে বলেছে, 'ছেলেটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। রূপালির উপযুক্ত সে। ইন্দলের হাতে রূপালিকে তুলে দিতে পারলে তৃপ্তিতে চোখ বুজতে পারব আমি। অঞ্জলিদি তুমি যদি কোকিলাদিকে রাজি করাও তাহলে অনেক উপকার হয় আমার।'

কোকিলা অঞ্জলির কাছে কথাটি পাড়ল একদিন। সেই যে দুজনে একসঙ্গে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল একদিন, সেই অনুমতি এখনো অব্যাহত আছে। জমাদার বদলেছে, কিন্তু অনুমতি বদলায় নি। দুজনে এখনো রাস্তা সাফ করে। কখনো স্ট্যান্ড রোডে, কখনো ঘাট ফরহাদবেগে, কখনো টেরিবাজারের অফিসের গলিতে, আবার কখনো কোতোয়ালির সামনে। সেদিন দুজনে কাজ করছিল লালদীঘির পূর্ব পাড়ে। জেলখানার গেইট সংলগ্ন রাস্তা সাফাইয়ের দায়িত্ব পড়েছিল দুজনের ওপর। ভোর সকালে কাজে হাত লাগিয়েছিল। ডাণ্ডাওয়ালা ঝাড়ু দিয়ে রাস্তার বালু সাফ করতে করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিল তারা। জেলখানার গেইটে বড় আমগাছ। গাছতলায় বসে পড়েছিল দুজনে, পাশাপাশি। আকাশ মেঘলা মেঘলা। জ্যৈষ্ঠের ঝাঁজ কমে এসেছে অনেকটা। আষাঢ় আসি আসি করছে। দমকা শীতল বাতাস বইছে মাঝে মাঝে, দুজনের ঘর্মাক্ত শরীরে এই হাওয়া স্বস্তি জাগাচ্ছে।

কোকিলাই শুরু করল প্রথমে, 'দিদি, ইন্দলের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনেছ ?'

'তোমার তো সৌভাগ্য। হরিজন সমাজে বরপক্ষই প্রস্তাব নিয়ে আসে, তোমার কাছে এসেছে মেয়ে পক্ষ। তো, বিয়ে করাতে রাজি হচ্ছ না কেন ?' জিজ্ঞেস করে অঞ্জলি।

কোকিলা গোল গোল চোখ করে অঞ্জলির দিকে, 'তুমি জানলে কী করে ?'

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বলে, 'সর্দারের বউ না আমি! সর্দার জানে না এই রকম ঘটনা আছে এই পট্টিতে ? সর্দার জানলে তো আমিও জানব, কী বলো ?'

তারপর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হলো। অনেক যুক্তিতর্ক, অনেক ভয়, অনেক শঙ্কা, অনেক তৃপ্তি, অনেক আনন্দ, অনেক বেদনার কথা বলাবলি হলো দুজনের মধ্যে। শেষে অঞ্জলি বলল, 'রূপলালকে ফিরাইও না কোকিলাদি। শুনেছি মেয়েটি ভালো। ছেলে তোমার উপযুক্ত। ছেলের জন্যই একটা ঘর পাচ্ছ ঝাউতলিতে। ওখান থেকে যাতায়াত করবে ওরা। ছেলে বিয়ে করিয়ে বউ পাবে, ঘর পাবে। দেখছ না, আমরা, শিউচরণরা আর রামগোলাম কী ঠাসাঠাসি করেই না জীবন কাটাচ্ছি। তাও বুদ্ধি করে বারান্দায় নাতির জন্য সর্দার ব্যবস্থা করেছিল বলে বড় পাস দিয়েছে আমাদের রামগোলাম।'

কোকিলা বলে, 'শুনেছি দিদি তোমাদের রামগোলাম বড় পাস দিয়েছে। সে নাকি সর্দারের মতো আমাদের কথা ভাবে! বড় আনন্দ লাগছে দিদি, সর্দারের ঘরে আরেক সর্দারের জন্ম।

অঞ্জলি বলে, 'ঈশ্বরকে বলো কোকিলাদি, আমাদের রাম যেন মেথরসমাজকে না ভুলে।'

তারপর রূপালির সঙ্গে ইন্দলের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিনের মাথায় মারা গেল রূপলাল। বাপের ঘরেই জীবন শুরু করল রূপালি।

মেথরপট্টির ছোট ছোট ঘরে ইন্দল-রূপালির মতো অনেকের দাম্পত্যজীবন শুরু হয়, অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কেউ সুখে জীবনযাপন করে, কেউ ঝগড়া-ফ্যাসাদে মগ্ন থাকে। কেউ মদে সুখ খোঁজে, কেউ মন্দিরে দুঃখ জমা রাখে। কেউ ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে

দেখে, কেউ সামষ্টিক স্বার্থে আনন্দ পায়। কেউ নিজের কথা ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়, কেউ দিশেহারা সমাজের মঙ্গলের জন্য নির্ভয়ে এগিয়ে চলে ভয়াল বিপদের দিকে।

৪

আগু-পিছু হাঁটতে হাঁটতে সেই দুপুরে গুরুচরণ, কার্তিক আর রামগোলাম বড় সাহেবের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ভেতরে ঢুকতে চাইল তারা। বাধা দিল ইউসুফ, ছালাম সাহেবের খাস পিয়ন। বলল, 'দেখা করা যাবে না এখন, সাহেব ব্যস্ত। ফাইলে সাইন করতে করতে হয়রান। আজ হবে না। অন্যদিন এসো।'

কার্তিক বলল, 'অন্যদিন হলে চলবে না। আজই দেখা করতে হবে।'

ইউসুফ বলল, 'বললাম তো দেখা হবে না।' স্বগতকণ্ঠে বলল, 'বেটা লাট সাহেবের বাচ্চা! আজই দেখা করতে হবে।'

এবার গুরুচরণ বলল, 'ইউসুফ ভাই, বড় সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেখা করা জরুরি। মরাবাঁচার প্রশ্ন। বাধা দিও না।'

এবার ভদ্রবেশের ভেতর থেকে ইউসুফের আসল চেহারা বেরিয়ে এল। বলল, 'বাধা দিলে করবা কি?'

কার্তিক এবার উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, 'করব কি মানে, জোর করে ঢুকব।'

'অই মেথরের বাচ্চা, ঢুক তো দেখি, তোর কইলজায় গুর্দা কেমন দেখি।' একটু থেমে ইউসুফ আবার বলল, 'আর অই বেটা মেথরের সর্দার আমারে ডাকে ভাই! আমি মেথরের ভাই হলাম কেমনে রে বেটা?'

রামগোলাম ধীর পায়ে ইউসুফের সামনে এগিয়ে এল। একেবারে ঠান্ডা গলায় বলল, 'ইউসুফ সাহেব, আপনি বললেন বড় সাহেব কাজে ব্যস্ত, আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম—তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। ঘুমানোকে ব্যস্ততা বলে নাকি?'

'তুমি কে রে?' রামগোলামের দিকে লালচোখ মেলে জিজ্ঞেস করে ইউসুফ।

রামগোলাম আগের কণ্ঠে বলে, 'আমার পরিচয় পরে, আগে বলেন ভিতরে যেতে দেবেন কিনা?'

ইউসুফ রামগোলামের ভঙ্গি দেখে ভড়কে যায়। তারপরও কণ্ঠে জোর রেখে বলে, 'যদি না দিই, কী করবে?'

এই সময় কার্তিক হুংকার দিয়ে ওঠে। বলে, 'কী করে বাধা দাও দেখি।' বলে দরজার দিকে ছুটে আসে কার্তিক।

কার্তিকের হুংকারে ছালাম সাহেবের তন্দ্রা ছুটে যায়। ধড়ফড় করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন তিনি। উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কী হইছেরে ইউসুফ? কারা কথা বলে?'

বাম হাতের ইশারায় গুরুচরণদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলে দ্রুত পায়ে ভেতরে যায় ইউসুফ। বলে, 'মেথররা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় স্যার।'

'মেথররা মানে?' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞেস করেন আবদুস ছালাম।

'অই স্যার, মেথর সর্দার গুরুচরণ না মুরুচরণ। ওর সঙ্গে আবার চ্যালাও আছে দুইজন।' ইউসুফের মনে রাগ তখনো গর্জাচ্ছে।

'অ আচ্ছা, তুই একটা কাজ কর ইউসুফ। জমাদার হারাধনকে ডেকে আন। আর ওদের ভিতরে আসতে দে।' ছালাম সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

গুরুচরণরা ভেতরে আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে হারাধন জমাদার। ধুতির ওপর তিন পকেটের ফতুয়া। সাদা ফতুয়ার দু'পাশে দুটো জেব। বুকের বামপাশে একটা। ওই বুক পকেটে বাহারি ঘড়ি। বুক পকেটের তলায় ঘড়ি পকেট। চিকন চেইনে ঘড়িটি বাঁধা। চেইনের একমাথা বোতামের সঙ্গে আটকানো, ঘড়িসমেত অন্যমাথা ঘড়ি-পকেটে। কিছুক্ষণ পর পর পকেট থেকে ঘড়ি বের করেন হারাধনবাবু। ওটাই তার মুদ্রাদোষ। পানের কষে দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় জং ধরেছে। জিহ্বায় পুরু আস্তর। ভুরভুরে জর্দার গন্ধ মুখে। কিছুক্ষণ পর পর নাক ঝাড়েন। এতকিছুর পরও ছালাম সাহেব হারাধন বাবুকে কাছে রাখেন। হারাধন বড় ধুরন্ধর। মেথরদের ঘায়েল করার জন্য হারাধনের মতো একটা মাথাই যথেষ্ট।

কাছে এলে ছালাম সাহেব প্রথম চোখ তোলেন রামগোলামের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা—এ কে? গুরুচরণের পোড়খাওয়া চোখ। বড় সাহেবের চোখের ভাষা বুঝতে দেরি হয় না। তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার নাতি স্যার, রামগোলাম। গত বছর মেট্রিক পাস করেছে স্যার।'

'অ....।' বলে চুপ মেরে যায় ছালাম সাহেব। বাম পাশে, একটু পেছনে হারাধন দাঁড়ানো।

'তো কী জন্য এসেছ তোমরা, বড় সাহেবের কাছে?' ধূর্তচোখ গুরুচরণের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করেন হারাধন।

গুরুচরণ ভূমিকা ছাড়া বড় সাহেবকে উদ্দেশ করে বলে, 'হুজুর, আমাদের চাকরি নাকি এখন থেকে সবাই করতে পারবে? নোটিশ জারি করেছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, করেছি নোটিশ জারি।' নিস্পৃহ কণ্ঠে ছালাম সাহেব বলেন।

গুরুচরণ অনুনয়ের সুরে বলে, 'আমরা মাঠে মারা যাব হুজুর। মেথর আমরা, অন্য কোনোখানে চাকরি করার সুযোগ নেই আমাদের। হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য খুলে দিলে এই চাকরিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সবাই। না খেয়ে মারা পড়ব আমরা। আমাদের ওপর...।'

গুরুচরণকে কথা শেষ করতে দেন না হারাধনবাবু। বলেন, 'স্বাধীন দেশ এটি। সব চাকরিতে জাতপাত নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার। শুধুমাত্র মেথরদের জন্য নির্ধারিত কোনো চাকরি নেই এখন এদেশে।

'ছিল। এক সময় ছিল। ব্রিটিশ আমলে ছিল, পাকিস্তান আমলে ছিল। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রথম দিকেও ছিল। একাজ শুধু মেথরদের—এই রকম ওয়াদা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের আনা হয়েছিল এদেশে। যুগ যুগ ধরে আমাদের বাপ্ দাদারা কাঁধে-মাথায় করে গু-মুত টেনেছে। আজকে স্যানিটারি পায়খানা হয়েছে। তাই বলে আমাদের চাকরি কেড়ে নেবেন এখন?' রামগোলাম ধীরে ধীরে বলে গেল।

সদ্য তরুণটির কথা শুনে ছালাম সাহেব তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন। বলে কী ছোকরা! একেবারে ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস আওড়ে যাচ্ছে।

হারাধনবাবুর বুঝালেন—রামগোলাম বুদ্ধি রাখে। চোখ রাঙিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে খেলতে হবে এর সঙ্গে। বললেন, 'দেখ, দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে, ছোট বড় চাকরির ওপর চাপ আসছে। আবর্জনা সাফাইয়ের কাজকে এখন কেউ ছোট কাজ বলে মনে করছে না। তা ছাড়া, ওদেরও তো বাঁচতে হবে। ওই চাকরিতে তোমাদের দাবি থাকতে বেশি। অন্য জাতের দু'চার জন তোমাদের এ চাকরি নিলে ক্ষতি কী?'

রামগোলাম বলল, 'আপনি হিন্দু মানুষ। আপনাদের পূজা করেন ব্রাহ্মণ, তাই না?'

'হ্যাঁ।' হারাধনবাবু বললেন।

'ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ তো পূজা করতে পারে না, তাই না? কেন অন্য কেউ পূজা করতে পারে না? এটা

রেওয়াজ, শাস্ত্রীয় বিধান। পূজায় ব্রাহ্মণদের অধিকার। এই অধিকার যুগযুগ ধরে অক্ষুণ্ন আছে হিন্দু সমাজে। মেথররা গু-মুত সাফ করবে, আবর্জনা পরিষ্কার করবে—এটাও শাস্ত্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিধান। ব্রাহ্মণদের পূজা করানোর অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া না যায়, তাহলে মেথরদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থায় সায় দিচ্ছেন কেন আপনি ?' রামগোলাম বলল।

হারাধনবাবু চোখ ছানাবড়া করে রামগোলামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ওই সময় নতুন একটা কণ্ঠস্বরে চমকে তাকাল সবাই। দেখল—গুরুচরণের পেছনে যোগেশ দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, 'কী যে বলো না রামগোলাম। কোথায় ব্রাহ্মণ আর কোথায় আমরা! জমাদার বাবুর সঙ্গে কু-তর্ক করো না। চাকরি তো আমাদের যাচ্ছে না। দু'চারজন না হয় চাকরিতে ঢুকল।'

কার্তিক আহত বাঘের মতো গরগর করে উঠল, 'বেইমান মীরজাফর এসে গেছে।'

কার্তিকের গালাগাল গায়ে মাখল না যোগেশ। তারপর বিনীত ভঙ্গিতে ছালাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি ভুল বলেছি হুজুর ?'

'না তুমি ভুল বলো নি। তোমার লোকদের বুঝাও তুমি। সরকারের চাপ আছে আমার ওপর। অন্য জাতের লোকদের এই চাকরি দিতে হবে আমাকে।' বললেন আবদুস ছালাম।

গুরুচরণ বলল, 'তাহলে আমরা কোথায় যাব ?'

'বড় সাহেব কি তোমাদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছেন ?' হারাধন বাবু বললেন।

'আমাদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছেন না। শুধুমাত্র আমাদের ছেলেমেয়েদের পেটে লাথি মারছেন আপনারা। তাদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন।' বলল কার্তিক।

রামগোলাম বলল, 'এই গু-মুত আর আবর্জনা টানার কাজ ছাড়া আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই। লেখাপড়া জানলেও অন্য কোনো কাজ দেন না আমাদের। ওদের জন্য সকল চাকরির দরজা খোলা। আমাদের জন্য একটা ছাড়া, সব দরজা বন্ধ, যেটা খোলা সেটাতে ভেতর থেকে খিল তুলতে চাইছেন আপনারা।'

ছালাম সাহেব বললেন, 'এটা কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত। সবার জন্য এ চাকরি খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু তোমরা এ চাকরির দাবিদার হবে কেন ?'

গুরুচরণ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এ চাকরি শুধু আমাদের। আমাদের দাবি না মানলে আন্দোলনে নামব আমরা।'

চোখ মুখ কুঁচকে গর্জন করে উঠলেন ছালাম সাহেব, 'আন্দোলন করবে ? স্ট্রাইক করবে তোমরা ?'

গুরুচরণ ঠান্ডা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, কাজ বন্ধ করে দেব আমরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করে যাব।'

'আহা সর্দারজী, বড় সাহেব আর জমাদারবাবুর সামনে এসব কী বলছ তুমি ? মাথা ঠিক রেখে কথা বলো।' যোগেশ বলে।

কার্তিক বলে, 'সর্দারজীর মাথা ঠিক আছে। তোমার মাথা ঠিক করো বিভীষণ। তুমি হলে রাবণ বংশের বিভীষণ, বেইমান। তোমাকে আমরা দেখে নেব।'

কার্তিকের ঔদ্ধত্য দেখে ছালাম সাহেবের মাথা গরম হয়ে উঠল। বললেন, 'কী, কী বলছ তুমি মেথরের বাচ্চা। দেখে নেবে ? কাকে দেখে নেবে ?'

'হুজুর, আমরা তো মেথরের বাচ্চাই। অস্বীকার তো করি না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বলেও দাবি করি না। আপনারা কালাকানুন চালু করে প্রমাণ করতে চাইছেন অন্যজাতের মানুষেরাও মেথরের বাচ্চা। কারণ মেথররাই শুধু গু-মুত টানার কাজ করে।' রামগোল্যাম বলে।

হতভম্ব হয়ে যান ছালাম সাহেব। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। তিনি কী বলবেন ঠিক করতে পারেন না। ওই সময় ছালাম সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী যেন বলেন হারাধনবাবু।

হারাধনবাবুর কথা চোখ বন্ধ করে শুনলেন ছালাম সাহেব। কথা শেষ হলে হারাধন বাবু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু ছালাম সাহেব চোখ খুললেন না। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন তিনি। দেখা গেল— তার চোখমুখ থেকে একটু আগের রাগের চিহ্ন তিরোহিত হয়ে গেছে। শান্তচোখে কিছুক্ষণ রামগোলামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গুরুচরণের দিকে তাকিয়ে আবার রামগোলামের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বললেন, 'কী যেন নাম বলেছিলে তোমার ? রামগোলাম, মনে পড়েছে, রামগোল্যাম। তোমার নামের মধ্যে বিচক্ষণতা লুকিয়ে আছে। হিন্দু আর মুসলমান কালচার মিশে আছে তোমার নামে। নামের মতোই বিচক্ষণ তুমি। বয়সের তুলনায় তুমি অনেক বুদ্ধিমান। তোমার যুক্তি বেশ চমৎকার। কী বলেন হারাধনবাবু, রামগোলামের যুক্তির সামনে আপনি তো একেবারে চুপসে গেলেন।'

হারাধনবাবু টাকমাথা চুলকে বললেন, 'অসুরকুলে প্রহ্লাদ স্যার। ওকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দেন কর্পোরেশনে। এরকম চাল্যাক চতুর ছেলে দরকার স্যার আপনার।'

যোগেশ আকাশ থেকে পড়ল। বলে কী বেটা! চুলটা শুধু শুধু পেকেছে দেখি হারাধনবাবুর। শুনেছি—বুদ্ধিমানের টাকমাথা হয়। ওই কায়স্থ বেটার দেখি গোবরে ভরা মাথা। কাঁচা গোবরের ঝাঁজে মাথার মাঝখানের চুল পড়ে গেছে। সেই মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শালারপুত কী পরামর্শ দিচ্ছে বড় সাহেবকে! এমনি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে উঠেছে হরিজন পল্লীগুলোতে। সর্দারই তাদের পথ দেখাচ্ছে, উসকে দিচ্ছে। আর হারাধন্যা প্রস্তাব দিচ্ছে এই লিডারের নাতিকে চাকরি দিতে ? নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না যোগেশ। বলে ফেলল, 'কী যে বলেন জমাদারবাবু! রামগোলামের বয়স আর কত ? কোমল শরীর তার। আবর্জনা টানার মতো কষ্টের কাজ সে করতে পারবে না।'

'তুমি থাম যোগেশ। আমাদের কথায় নাক গলিও না। কার শরীর কোমল আর কার শরীর কঠিন—সেটা বিবেচনা করবেন আমাদের বড় সাহেব। মাঝখানে তুমি কথা বলো না।' যোগেশকে উদ্দেশ করে হারাধনবাবু ধমকে উঠলেন।

'না বলছিলাম কী আন্দোলন করার পাঁয়তারা করছে এরা। আর তাদেরকেই এত বড় উপহার!' যোগেশ হারাধনবাবুর ধমকে ভড়কে গেল না।

পেছন থেকে গর্জন করে উঠল কার্তিক, 'হারামখোর যোগেইশ্যা, এতদিন চুপে চুপে তুই হরিজন সমাজের ক্ষতি করছস, আজ প্রকাশ্যে বিরোধিতা! দেখে নেব আমি তোকে।

যোগেশ কাঁচুমাচু মুখ করে হারাধনবাবুর দিকে তাকায়। তার চোখে ত্রাসের চেয়ে ষড়যন্ত্রের ছায়া যেন। তারপর একটু গলা খাকারি দিয়ে বলে, 'তুমি আমাকে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছ কার্তিক। হারাধন স্যার আর বড়বাবু সাক্ষী রইলেন। আমি তো ভুল কথা বলি নি। লেখাপড়া জানা ছেলে, সে কেন এসে অশিক্ষিত মেথরদের সঙ্গে গু-মুত টানবে ?'

'আর আন্দোলন করার ষড়যন্ত্র করছি ভিতরে ভিতরে— একথা তুমি লাগাচ্ছ বড় সাহেবকে। আমরা যদি ষড়যন্ত্র পাকাতাম, তাহলে এখানে আসতাম না। আমরা যা করব, তা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলাম আজ। এখানে তো লুকোচুরির কিছু নেই।' এতক্ষণ চুপ থাকা গুরুচরণ যোগেশকে উদ্দেশ করে বলল।

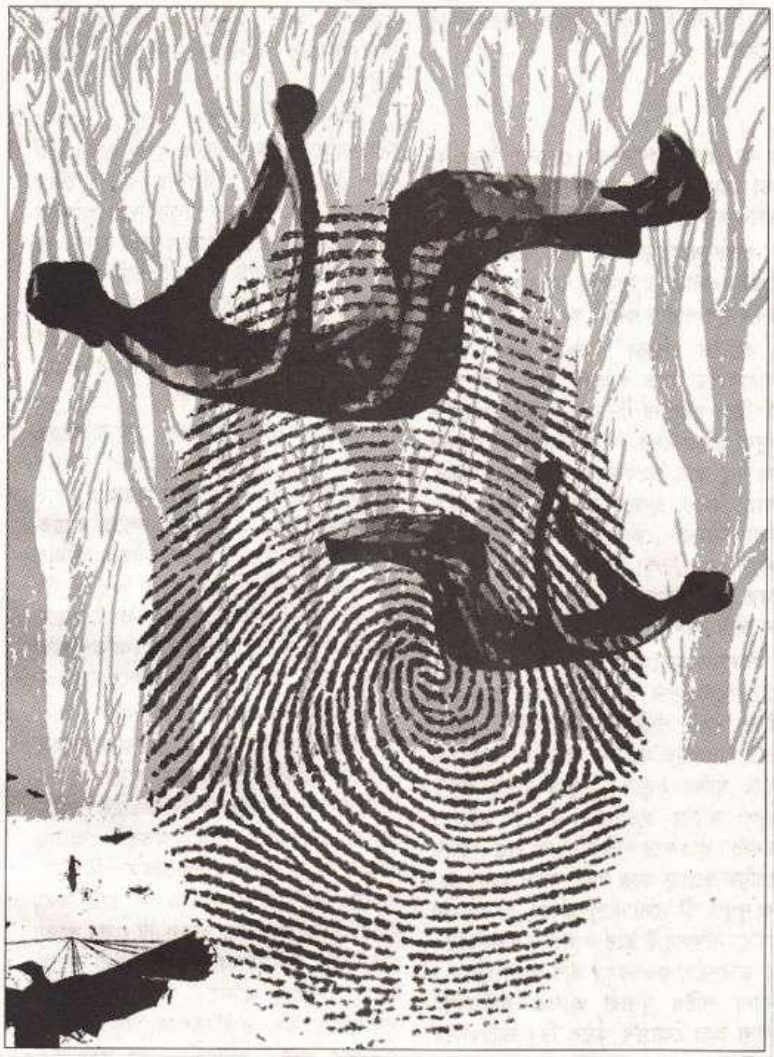

হারাধনবাবু বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বের করলেন। মনোযোগ দিয়ে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'বড় সাহেব যে রামগোলামকে গু-মুত টানার চাকরি দেবেন—এ তুমি বুঝলে কী করে যোগেশ ? এই অফিসেও তো চাকরি দিতে পারেন।'

একথা শুনে গুরুচরণের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তৃপ্তির আভা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সেটা ধুরন্ধর হারাধনবাবুর চোখ এড়াল না। নিস্পৃহকণ্ঠে হারাধনবাবু বলে যেতে লাগলেন, 'কার্তিকের মাথা একটু গরম। ও তোমাকে এমনি এমনি ভয় দেখাচ্ছে। ও তোমাকে তো আর খুন করবে না! আর হ্যাঁ, গুরুচরণ এত আন্দোলন-ফান্দোলনের কথা বলছ কেন ? বড় সাহেবের কাছে এসেছ, তোমাদের দাবির কথা বলেছ। তিনি কী করেন দেখ।' তারপর একটা ফাঁকা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। নিবিড় কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের কত আন্দোলন হলো, থামল। তোমরা না জানতে পার, রামগোলাম হয়তো জানবে। আন্দোলন দিয়ে দাবি আদায় করতে পারবে না। ওসব হুমকি-ধমকি না দিয়ে বড় সাহেব কী বলেন, শুন।' বলেই তিনি আবদুস ছালামের দিকে বামচোখ ছোট করে তাকালেন।

আবদুস ছালাম বললেন, 'তোমাদের দাবি একেবারে ফেলনা না। একটু সময় দাও আমাকে। দেখি কী করা যায়। আর হারাধনবাবু, অফিসে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখেন তো রামগোলামকে কোথায় ফিট করা যায় ?'

রামগোলাম বলে উঠল, 'আমরা তো আপনার কাছে চাকরির তদবির নিয়ে আসি নি। এসেছি দাবি নিয়ে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনে কোনো চাকরি নিব না।'

'এটা তুমি অভিমানের কথা বলছ। তোমার দাদা জানে—বর্তমানে কর্পোরেশনের অফিসে চাকরি পাওয়া কত কঠিন। কী বলো গুরুচরণ ?' আবদুস ছালাম বললেন।

'থাক স্যার থাক। এটা গুরুচরণ ঠিক করবে—রামগোলাম চাকরি নেবে কি নেবে না। আর রামগোলামকে কোথায় ফিট করবেন জিজ্ঞেস করেছিলেন। বয়স হয়ে গেছে আমার। লেখাজোখা করতে হয়। আমারই জুনিয়র করে দেন রামগোলামকে, জুনিয়র জমাদারবাবু।' বলেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন হারাধনবাবু।

'বললাম তো, আমি এই অফিসে চাকরি করব না।' দৃঢ়কণ্ঠ রামগোলামের।

কার্তিক বলে উঠল, 'আহা, তুমি থাম তো রামগোলাম। এ বিষয়ে পরে কথা বলব আমরা।'

আবদুস ছালাম বললেন, 'ঠিক আছে ওই কথা রইল, তোমরা আমাকে কিছুদিন সময় দিচ্ছ। দেখি উপরে যোগাযোগ করে তোমাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা ?' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমরা যাও এখন।'

গুরুচরণ, কার্তিক আর রামগোলাম বেরিয়ে গেল বড় সাহেবের রুম থেকে। হারাধনবাবু যোগেশকে উদ্দেশ করে বললেন, 'খেলাটা ভালোই খেলেছ মীরজাফর সাহেব। বড় সাহেব নিশ্চয়ই তোমার পাওনা বুঝিয়ে দেবেন। এখন যাও। বড় সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

যোগেশের মুখে ক্রূর হাসি। তার চোখে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। হারাধনবাবুর আদেশের পরও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত কচলাতে লাগল। তার দৃষ্টি ছালাম সাহেবের দিকে। তিনি বেল বাজিয়ে ইউসুফকে ডাকলেন। বললেন, 'ক্যাসে গিয়ে বলো যোগেশকে পাঁচশটি টাকা দিতে।'

কৃতার্থ যোগেশ ইউসুফের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। যোগেশ মনে মনে বলতে লাগল—হা ঈশ্বর, আজ কার মুখ দেখে যে সকালটা শুরু করেছিলাম! সামান্য বেইমানিতে এত প্রাপ্তি! ভাটিখানায় আজ জমবে খাসা। প্রতিদিন মনুলালের মদ গিলে যাচ্ছিলাম। শালা জনির কারণে গত ক'মাস ধরে মন বেশ খারাপ মনুলালের। সেই খারাপ মন আজ ভালো করে দেব। আজ সন্ধ্যার সকল খরচ আমিই বহন করব মনুলাল।

যোগেশ বেরিয়ে গেলে সালাম সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা খুব বেশি হয়ে গেল

না হারাধনবাবু ?'

'কিসের কথা বলছেন স্যার ?'

'ওই যে রামগোলামের চাকরি, তাও আবার একলাফে জুনিয়র জমাদার!'

'স্যার আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, আপনাকে আমি কী বুঝাব স্যার। তারপরও বলি—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে গুরুচরণের পর মেথররা এই রামগোলামকে সর্দার করবে। গুরুচরণের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে হল তাকে। সে শিক্ষিত। মেথরদের ঐক্যের সঙ্গে তার শিক্ষা যুক্ত হলে অনেক বড় শক্তিতে পরিণত হবে এরা। চাকরি দেওয়া মানে কিনে নেওয়া। আর আমার সঙ্গে চাকরি মানে তো বুঝেন। দিনরাত ব্রেইন ওয়াশ করব আমি। যদি পরিবর্তন না হয় তার গতিবিধি আমার নজরে থাকবে। তা ছাড়া এক দুই মাস চাকরি করলে টাকার প্রতি লোভ ধরে যাবে। আন্দোলন থেকে সরে আসবে। গুরুচরণের শরীর ঝটকে গেছে। চাকরির বয়স শেষ হয়ে আসছে তার।' দম নিয়ে নিয়ে কথাগুলো বলে গেলেন হারাধনবাবু।

'যদি রামগোলাম চাকরি না নেয় ?' সালাম সাহেবের সন্দিগ্ধ কণ্ঠ।

হারাধনবাবু বিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন, 'চাকরি ঠিকই নেবে রামগোলাম। গুরুচরণের চাকরি চলে গেলে অভাব ঢুকবে ঘরে। গুরুচরণই রাজি করাবে রামগোলামকে। তা ছাড়া আবর্জনা টানার চাকরি না, একেবারে জমাদারের চাকরি। রক্তমাংসের শরীর তো, লোভ সামলাবে কেমনে ?'

'আপনি তো জানেন ঘোষণা থেকে এক চুলও নড়ব না আমরা। সময় ফুরিয়ে গেলে অধৈর্য হয়ে যদি ওরা স্ট্রাইকে নামে ? গু-মুত আবর্জনা টানা একদিন বন্ধ তো—চট্টগ্রাম শহর অচল। উপর থেকে আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবে। বলবে—আমি টেকনিকেল নই। চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে আমার।' আবদুস ছালাম বললেন।

'পরের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দেন স্যার ? আপনি শুধু রামগোলামকে চাকরিটা দেন।' বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করলেন তিনি। ফতুয়ায় ঘড়ির ডায়াল ঘষতে ঘষতে বললেন, 'কোনো কালে মেথরদের আন্দোলন সাকসেসফুল হয়েছে বলেন স্যার। ওরা হলো—কুত্তার জাত, এক টুকরা মাংস সামনে ছুড়ে দিলেন তো ওটা নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করে দেবে। দু'চারজন মুখ্য আর দু'চারজন যুবককে কয়েকদিন মদে ডুবিয়ে রাখবেন। ওরাই স্ট্রাইক ভেঙে কাজে যোগ দেবে।'

'দেখা যাক।' বললেন বড় সাহেব।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন স্যার, আমি আছি।' দেঁতো হাসি হেসে হারাধনবাবু বললেন।

৫

'মা কা চোদ, খানকি কা লেড়কা, কুত্তা কা বাচ্চা যোগেইশ্যা! বেইমান শালা। সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! মেথরদের পেটে লাথি!'

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আহা কার্তিক! বাবাঠাকুর সামনে, ওনার সামনে তুমি এরকম মুখ খারাপ করছ কেন ?'

কার্তিক লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বাবাঠাকুরের দিকে তাকাল, গোল হয়ে বসা চারপট্টির মুখ্যদের দিকে তাকাল, সমবেত উৎসুক হরিজনদের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে নিম্নস্বরে বলল, 'দুপুর থেকেই মাথায় আগুন জ্বলছে আমার। দাবি নিয়ে গেলাম আমরা। কোথায় আমাদের সুরে সুর মিলাবে, না, উল্টো আমাদের ধমক। বলল, আমরা নাকি আন্দোলনের পাঁয়তারা করছি। কান ভারী করল বড় সাহেবের।'

সমবেত মানুষেরা দুপুরের সব কথা শুনতে চায়। কর্পোরেশন অফিসে থেকে ফিরে চার পট্টিতে খবর পাঠিয়েছিল গুরুচরণ। তারই তলবে চারপট্টির সচেতন হরিজনরা জমায়েত হয়েছে মন্দির চত্বরে। চত্বরে টিউব লাইট উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে ঘরে নারীরা রান্নায় ব্যস্ত। পট্টির স্বাভাবিক হুল্লোড় আজ বন্ধ। সবার মনে শঙ্কা, আজ দুপুরে কী হলো কর্পোরেশনে, কী বললেন বড়বাবু! দক্ষিণমুখী হয়ে বসেছেন বাবাঠাকুর। তাঁর ডানপাশে গুরুচরণ। তার পাশে মুখ্যরা। অন্যান্য পট্টির মুখ্যরা এলেও ঝাউতলার মনুলাল আর যোগেশ আসে নি। ভাটিখানায় মদে মগ্ন তারা আজ। মুখ্যদের পাশে অন্যান্যরা বসেছে। একটু দূরে রামগোলাম। আজ দুপুরের পর তার চেহারা থেকে তারুণ্যসুলভ কোমলতা অনেকটা তিরোহিত হয়ে গেছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে এক ধরনের কাঠিন্য। এখন সে কিছুটা আত্মমগ্ন।

গুরুচরণ কার্তিককে থামিয়ে দিয়ে দুপুরের সব কথা আদ্যন্ত বলে গেল। শেষে বলল, 'লোভ দেখাল—রামগোলামকে চাকরি দেওয়ার। আমার মতে রামগোলামের এ চাকরি নেওয়া উচিত নয়।'

কার্তিক বলল, 'আমি তোমার কথা মানতে পারলাম না সর্দারজী। আমার মতে রামগোলামের কর্পোরেশনে চাকরি নেওয়া উচিত।'

'আগামী মাসের পরের মাসের মাঝামাঝিতে আমার চাকরি খতম হবে। ওরা জানে আমার এই দুর্বলতার কথা। টোপ দিয়েছে। রামগোলামকে চাকরি দিয়ে আমাকে কিনতে চায়। কোনো কারণে দাবি আদায় না হলে তোমরা সবাই আমাকে দায়ী করবে। বলবে, সর্দার নাতির চাকরির বিনিময়ে নিজেকে বেঁচে দিয়েছে। না, না, এটা ঠিক হবে না। কর্পোরেশনে রামগোলামের চাকরি নেওয়া ঠিক হবে না।' গুরুচরণ বলল।

বান্ডেলের চেদিলাল বলল, 'ছালাম সাহেব কিছুদিন সময় চেয়েছেন তোমাদের কাছে। কিছুদিন মানে কতদিন ? দু'চার সপ্তাহ ? দু'চার মাস, নাকি বছর ? কিছুদিন বলতে কয়েক বছরও বোঝাতে পারেন ছালাম সাহেব। আমার মনে হয় এই কিছুদিনের মধ্যে কিছু একটা করবেন তিনি। রামগোলামকে কর্পোরেশনে চাকরি দেওয়ার মানে বুঝলাম না। প্রতিপক্ষকে মানুষ ঘায়েল করে, লালনপালন করে না।'

কার্তিক বলল, 'অনন্তকাল সময় দেব নাকি আমরা কর্পোরেশনকে ? এর মধ্যে অন্য জাতের মানুষদের চাকরি দিলে খবর করে দেব না আমরা! রামগোলামকে চাকরি দেওয়ার পেছনে কোনো চাল আছে কিনা—অতশত বোঝার দরকার কি আমাদের ? সর্দারের চাকরি যাবে সামনে। কর্পোরেশনে আমাদের হয়ে কথা বলার লোক তো আর থাকল না। সব শালা তো দালাল, যোগেইশ্যাকে দেখে একথা বলতে ইচ্ছে করছে আমার। যাক সেকথা। রামগোলাম যদি কর্পোরেশনে চাকরি নেয়, আমাদের লাভ। সর্দারজীর পর আমাদের দাবির কথা থেমে যাবে না, রামগোলাম আমাদের দাবি আদায় করবে।'

গুরুচরণ ইতস্তত করে বলল, 'তারপরও আমার মনে হয় না রামগোলামের চাকরি নেওয়া উচিত।'

'আমারও একই কথা সর্দারজী।' চেদিলাল বলল।

কোন ফাঁকে যে মদো শ্যামল পেছনে এসে বসেছে টের পায় নি কেউ। হঠাৎ জড়ানো গলা শুনে পেছনে ফিরল সবাই। শ্যামল বলছে,

'রামগোলাম চাকরি না নিলে বাবাধনকে চাকরি দেবে সেলাম সাব। হারাধন জমাদারের পাশে বাবাধন জুনিয়র। হারাধন আর বাবাধন মিলে বাম্বু দেবে মেথরদের পোন্দে। একদিকে সেলাম সাব, অন্যদিকে হারাধন-বাবাধন, অন্যদিকে পোন্দে বাম্বু। বাম্বু নিয়ে

মেথররা ঘুরবে আর সেলাম-হারাধন-বাবাধনরা হাততালি দেবে।'

গুরুচরণ বলল, 'তোমার মুখ খারাপ অভ্যাসটা গেল না শ্যামল। বাবাঠাকুর সামনে বসা। কী যে বলো না তুমি?'

'আমি ঠিকই বলছি, রামগোলাম চাকরি না নিলে কোনো হিন্দু বা মুসলমানকে ঢুকিয়ে দেবে সে চাকরিতে। তখন আমাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে উঠবে। রামগোলাম কর্পোরেশনে চাকরি নিক— এটা আমি চাই।' কথাগুলো বলবার সময় মাতলামির কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না শ্যামলের গলায়।

সমবেত মানুষদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। কেউ চাকরি নেওয়ার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে কথা বলতে লাগল। বাবাঠাকুর চুপচাপ বসে আছেন। চোখ তাঁর দূরের অন্ধকারে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে ডান হাতটি উপরে তুললেন তিনি। গুঞ্জন থেমে গেল। ভরাট কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমার বিবেচনায় কার্তিক যথার্থ বলেছে। গুরুচরণের চাকরি শেষ হলে কর্পোরেশনে তার গুরুত্ব থাকবে না। সত্যি বলতে কী, গুরুচরণের মতো সাহসী হরিজন বর্তমানে কর্পোরেশনে নেই। তোমাদের পক্ষে কথা বলার লোক ফুরিয়ে যাবে। গুরুচরণদের যুগ গেছে, এখন ধাপ্পাবাজির যুগ। ধাপ্পাবাজদের জবাব দেবার জন্য বুদ্ধির দরকার। কার্তিক গুরুচরণের কথা শুনে মনে হচ্ছে রামগোলামের সেই বুদ্ধি আছে।' বলে বাবাঠাকুর রামগোলামের দিকে তাকালেন। রামগোলাম মুগ্ধদৃষ্টিতে তখন বাবাঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবাঠাকুর ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। বামপাশে বসিয়ে কাঁধে হাত রাখলেন। আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, 'গুরুচরণের শরীর ঝটকে গেছে। বার্ধক্য তার শরীরকে জীর্ণ করে ফেলেছে। সামনে তোমাদের খারাপ দিন আসছে। হরিজন সমাজের ভার বইবার জন্য একজন নেতা দরকার। আমার বিশ্বাস, রামগোলাম সেই বার বইতে পারবে। ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা সহজ হবে। চাকরি নিলে রামগোলাম কাছে থেকে কর্পোরেশনের হালচাল বুঝতে পারবে। তার চাকরিটা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।' তারপর সমবেত হরিজনদের উদ্দেশে বললেন, 'কী বলো তোমরা?'

চেদিলালই সবার আগে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন বাবাঠাকুর। রামগোলাম চাকরি নিলে আমাদের ভীষণ উপকার হবে।'

সমবেত সবাই চেদিলালকে সমর্থন করল। কার্তিকের মুখে জয়ের হাসি। গুরুচরণের মুখ দেখে তার মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। হাজারো বলিরেখার অন্তরালে ভেতরের আনন্দকে লুকিয়ে রেখেছে সে। কবে কোন কালে জীবন শুরু করেছিল সে। লেখাপড়া তেমন করে নি। ভ্যাগ্যিস বাপের কথা শুনে ড্রাইভারিটা শিখে নিয়েছিল। সেই সুবাদে না তুফান মেইলে চাকরি পাওয়া। এক দুই বছর করে কতটি বছর চলে গেল জীবন থেকে। সমাজের মানুষেরা সর্দার বানাল তাকে। বলল— তোমার মতো সৎ ও সাহসী মানুষ নাই চার পট্টিতে। কী করেছে সে সর্দার হয়ে? হরিজনদের বিপদে আপদে বুক পেতে দিয়েছে— এই যা। প্রত্যেক সমাজে কিছু ন্যায়-অন্যায় ঘটে। হরিজন সমাজেও কখনো সখনো অন্যায় করেছে কেউ কেউ। সর্দার হিসেবে সালিশ করতে বসে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নি সে। প্রয়োজনে রাগ দেখিয়েছে। বিচারের সময় তার কাছে মুখ্য আর সাধারণ হরিজন সমান বিচার পেয়েছে। আর কর্পোরেশনে কোনো হরিজনের প্রতি অবিচার হলে প্রতিবাদ করেছে। সেই অবিচারের প্রতিকার যে সবসময় হয়েছে— এমন নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছে বঞ্চিত হরিজনরা। প্রতিবাদের জন্য মারধরও খেতে হয়েছে তাকে। হরিজনদের ভালোবাসা অপমান আর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষতিটা পুষিয়ে দিয়েছে। আজ বাবাঠাকুর জানিয়ে দিলেন—গুরুচরণের দিন শেষ। এখন নতুন যুগের সূচনা। এ যুগের জন্য চাই নতুন নেতা। বাবাঠাকুর রামগোলামের কথা বলেছেন, আকারে ইঙ্গিতে। তার স্থানে রামগোলাম যে তাঁর পছন্দ তা বোঝা যাচ্ছে। কী আনন্দ আজ তার! অশিক্ষিত গুরুচরণের জায়গায় শিক্ষিত রামগোলাম। সে মরে যাবে একদিন; কিন্তু বংশধর রামগোলাম, তার নাতি রামগোলাম মেথরপট্টির সর্দার হয়ে উঠবে। হরিজনদের সুখদুঃখের ভাগিদার হবে সে। শিউচরণের জন্য চাপা দুঃখ ছিল তার মনে। ম্যাদামারা শিউচরণ। কিন্তু ঈশ্বর রামগোলামকে পাঠিয়েছেন তার ঘরে। আজ তৃপ্তিতে চোখ বুজতে পারবে সে। হঠাৎ বাবাঠাকুরের গম্ভীর কণ্ঠে বাস্তবে ফিরে এল গুরুচরণ।

বাবাঠাকুর বললেন, 'আর একটা কথা, চার পট্টির সবাই আছো এখানে। সর্দার নির্বাচন করো তোমরা, গুরুচরণের পরে কে সর্দার হবে তা ঠিক করো তাড়াতাড়ি। গুরুচরণের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বললেন বাবাঠাকুর। 'আর হ্যাঁ, রামগোলাম কর্পোরেশনের চাকরিটা নেবে। রাত হয়ে গেছে অনেক, এবার আস তোমরা।' গুরুচরণকে অপেক্ষা করার ইশারা করে সমবেত হরিজনদের বললেন বাবাঠাকুর।

একে একে সবাই চলে গেলে বাবাঠাকুর চোখ ফেরালেন গুরুচরণের দিকে। বললেন, 'আমার ওপর রাগ করলে গুরুচরণ?'

'কেন, কেন বাবাঠাকুর?'

'ওই যে তোমার দিন শেষ হয়ে যাবার কথা বললাম। বললাম—আরেকজন সর্দার নির্বাচন করতে।'

'এটা তো ঠিক যে আমার শরীরে ঘুণ ধরেছে। ভেতরটা ঝুরঝুরে হয়ে গেছে আমার। রাতে রাতে জ্বর ওঠে। কাউকে বলি নি সে জ্বরের কথা। এটা তো ঠিক—একদিন যেতে হবে আমাকে। মেথরদের দুর্দিন সামনে। আমার অভিজ্ঞতা বলছে সবকিছু হারাতে যাচ্ছি আমরা। ছালাম সাহেবরা সবকিছু কেড়ে নেবে আমাদের। সময় নিয়েছে শুধু। আমি জানি— একদিন খড়্গটা নেমে আসবে হরিজনদের ঘাড়ে।' গুরুচরণ বলল।

বাবাঠাকুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়েছে। অসম যুদ্ধ এটি। কর্পোরেশন আমাদের ভালোর দিক চাইবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে— কর্পোরেশন আদেশটি ফিরিয়ে নেবে না। তোমাদের রিজিকে ভাগ বসাবে অন্যেরা। কর্পোরেশন তাদের সহায় হবে। তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছ। সামনের যুদ্ধ ভয়ংকর। তুমি পারবে না সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে। তাই বলেছি নতুন সর্দার নির্বাচন করতে। তুমি ভুল বুঝ না আমাকে। তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

'আমি জানি সেটা বাবাঠাকুর।'

যেন গুরুচরণের কথা কানে ঢুকে নি বাবাঠাকুরের। অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার দিনও শেষ হয়ে আসছে। রামগোলামকে হরিজন পল্লীর সর্দার হিসেবে দেখে যেতে চাই আমি।'

গুরুচরণ চমকে তাকাল বাবাঠাকুরের দিকে। স্মিত হেসে বাবাঠাকুর বললেন, 'ঠিক তাই। রামগোলাম তোমার পরে সর্দার হোক এটা চাই আমি।'

গুরুচরণের মুখ দিয়ে কথা সরে না। একী বলছেন বাবাঠাকুর? তার মনের কথা বাবাঠাকুর ধরতে পারলেন কী করে?

'ঘরে যাও গুরুচরণ।' বলে উঠতে যাবেন ওই সময় অন্ধকার ঠেলে কে যেন এগিয়ে এল সামনে। কাছে এলে চেনা গেল— বাভেলের চমনলাল।

'কী ব্যাপার চমনলাল? এত রাতে, তুমি এখানে?' একটু থেমে বাবাঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো বিপদ বুঝি? কার কাছে এসেছ? গুরুচরণের কাছে?'

'দুজনের কাছেই এসেছি ঠাকুর। বড় বিপদ আমার, ছেলে চলে যেতে চায় আমাদের ছেড়ে। কী কুক্ষণেই যে রামপ্রসাদের মেয়েকে ছেলের বউ করে এনেছিলাম?'

'ঘটনা কী চমনলাল? খুলে বলো। রাত অনেক হয়েছে। বাবাঠাকুর ঘুমাতে যাবেন। সংক্ষেপে বলো।' গুরুচরণ বলল।

বান্ডেল পট্টির তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের দোতলার নয় নম্বর ঘরের বাসিন্দা চমনলাল। চার ছেলে দুই মেয়ে তার। পিতামহ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এগারজনের সংসার। খাবার যাই হোক বাসস্থানের সংকট প্রকট চমনলালের পরিবারে। ইতোমধ্যে দুই ছেলে বিয়েযোগ্য হয়ে উঠেছে। বড় মেয়েটিও বিয়ের বয়সের কাছাকাছি। চমনলাল চাইল—মেয়েটিকে বিয়ে দিতে। কিন্তু স্ত্রী চাইল—আগে বড় ছেলের বউ আসুক ঘরে। অনেক ঝুট-ঝামেলার পর শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথাই মানতে বাধ্য হলো চমনলাল। মাদারবাড়ীর রামপ্রসাদের মেজমেয়েকে ছেলের বউ করে আনল চমনলাল। এইট পর্যন্ত পড়েছে শক্তিলাল। বউ পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল ছেলের। সারাক্ষণ বউ বউ। রামপ্রসাদ ডাকসাইটে। কর্পোরেশনে হাত আছে তার। বিয়ের পর কন্যা রাধিকার চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলল রামপ্রসাদ। রাধিকা ঠোঁটকাটা ধরনের। নিজের ছাড়া অন্য কারও স্বার্থের বা সুখের কথা ভাবতে সে নারাজ। রামপ্রসাদের ছোট সংসার। ওখানে থেকে চমনলালের রাবণের সংসারে এসে হাঁসফাঁস শুরু করল রাধিকা। ঘরের এখানে ওখানে মানুষ থিকথিক করে। অস্বস্তি লাগে রাধিকার। তার মেজাজ খিচড়ে যেতে থাকে। প্রথমে ননদিনীদের সঙ্গে খাটাসখুটুস শুরু হয়। মধ্যস্থতা করতে এসে শাশুড়িও খোঁচা খায় রাধিকার। মায়ের অপমানে দেবররা ক্ষেপে যায়। পারিবারিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। এর মধ্যে শক্তিলাল ফ্রি-পোর্টে চাকরি পায়। ঝাড়ুদারেরই চাকরি। কিন্তু মেথর বলে ঘৃণা নেই সেখানে। কুরিয়ান প্রতিষ্ঠান। বেতনও কর্পোরেশন থেকে বাড়া। স্বামীর বেতনের খবর রাধিকার অজানা থাকে না। পারিবারিক অসহিষ্ণুতার সঙ্গে স্বামীর উচ্চ-বেতনের দেমাক যুক্ত হয়ে রাধিকার মেজাজ তুঙ্গে ওঠে। এক রাতে স্বামীকে বলে—এখানে আর নয়। আমি আয় করছি, তোমারও বেতন কম নয়। চল আমরা অন্য কোথাও বাসাভাড়া নিই। মা-বাবা-ভাইবোনের কথা তুলে শক্তিলাল। দায়িত্ববোধের কথা বলে। রাধিকার যুক্তি—আহা! আমি তো তোমার মা বাবাকে অবহেলা করতে বলছি না। প্রয়োজনে অবশ্যই তাদের সাহায্য করবে। আমি তোমার কাছে একটু স্বস্তির জায়গা চাই। পারবে না তুমি আমাকে স্বস্তির আনন্দটুকু দিতে? নিজের ভাষায় এইরকম করে বোঝাতে চাইল রাধিকা স্বামীকে। শক্তিলাল রাধিকার মধ্যে জীবনীশক্তি খুঁজে পায়। স্ত্রীর কথায় সম্মতি জানায় শক্তি। সন্ধ্যায় চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা তুলে ধরে মা-বাবার সামনে। ভাইবোনেরা হতবাক হয়। মা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাপ তাকে বোঝায়—ওই কাজটি করো না বাপজান। তুমি চলে গেলে সমাজে আমার মাথা হেট হয়ে যাবে। বলবে চমনলালের বড় ছেলে মা-বাপকে ভাত না দিয়ে বউ নিয়ে কেটে পড়েছে। তা ছাড়া, কোথায় যাবে তুমি? নিশ্চয় কোনো পট্টিতে বাসা নেবে না তুমি? পট্টিতে বাসা পাবে কোথায়? নিজের থাকার জায়গা নেই, ভাড়া দেবে কোত্থেকে? বউয়ের প্ররোচনায় ভদ্র সমাজে বাসা নিতে চাইছ তুমি? পরিচয় গোপন করে থাকবে? কিন্তু একদিন না একদিন তোমার পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে। ভদ্রলোকরা আর যাই সহ্য করুক, মেথরদের সহ্য করে না কখনো। পরিচয় জানতে পারলে অনেক খেসারত দিতে হবে তোমাদের। ওই ভুল করো না বাবা। আমাদের ছেড়ে যেয়ো না। শক্তিলাল উদাসীন চোখে আকাশের তারা গুনে। চমনলাল দৌড়ে যায় রাধিকার কাছে। বলে— বউ তুমি শক্তিকে থামাও। ওকে এত বড় ভুল করতে দিয়ো না। যে স্বপ্ন নিয়ে তোমরা আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছ, সে স্বপ্ন কখনো পূরণ হবার নয়। বাঙালিরা তোমাদের আসল পরিচয় একদিন জানতে পারবে। তখন তোমাদের লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না। দলনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য কোনো পথ খুঁজে পাবে না তখন। দোহাই বউ তোমার, আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেয়ো না তোমরা। রাধিকা শ্বশুরের দিক থেকে মুখ ফিরায়। চমনলাল আবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—বলে, থাকার ঘরটিই ছেড়ে দিচ্ছি আজ থেকে তোমাদের। আমরা তো রান্নাঘরে ঢুকেছি অনেক আগে। ছেলেমেয়েদের ঘরের বাইরে এধারে ওধারে থাকতে বলব। ওরা আর কখনো তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। তোমার শাশুড়ি ভুলেও আর কোনোদিন তোমার মনে কষ্ট দেবে না। রাধিকা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নখে নেইলপলিশ লাগায়। চমনলাল বোঝে—ছেলে আর ছেলের বউ সিদ্ধান্তে অটল। তারা চলে যাবেই। এর আগে তার কানে এসেছে—বহদ্দারহাট না ষোলশহরের দিকে ঘরভাড়া নিয়ে ফেলেছে শক্তিলাল। শুধু যাওয়াটা বাকি। নিরুপায় হয়ে এই গভীর রাতে মন্দির চত্বরে এসেছে চমনলাল। বাবাঠাকুর আর সর্দারজী যদি তার ছেলেকে ফেরাতে পারে! সব শুনে বাবাঠাকুর শুধু বললেন, 'যে যেতে চায়, তাকে যেতে দাও।'

যেতেই দিল চমনলাল। দুদিন পর এক সকালে বান্ডেলপট্টির মানুষেরা দেখল—টুকটাক কিছু জিনিসপত্র নিয়ে শক্তি-রাধিকা রওনা দিয়েছে চেনা গন্তব্যে, অচেনা সমাজে।

৬

শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। শুক্রবারের সকালটা চার হরিজন পল্লীতে শুরু হয় একটু দেরিতে। অন্যান্য দিন ভোর সকালে দৌড়াতে হয় কর্পোরেশনের দিকে। নগর তখন ঘুমে কাদা। নাগরিকেরা ঘুম থেকে উঠার আগে নগরকে বাসযোগ্য করে তুলতে হয় হরিজনদের। গোটা দিন এবং রাতের বর্জ্য রাস্তার ধারে ধারে, ডাস্টবিনে অথবা ডাস্টবিনের দূরে-কাছের জায়গায়। কর্পোরেশন-নির্মিত ডাস্টবিন ছাড়াও এলাকাবাসীর মর্জিমাফিক ছুড়ে ফেলা ময়লার স্তূপ অলিগলিতে। এগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্ব হরিজনদের। তাই সুবেহসাদেকে বিছানা ছাড়ে তারা।

শুক্রবারের সকালটা তারা নিজের মতো করে উপভোগ করে। বিলাসী হয়ে ওঠে তারা শুক্রবারের সকালে। বড় মগ নিয়ে চা-দোকানে যায়। দোকানদারের ছুড়ে দেওয়া পরোটা আর ছোঁয়া বাঁচিয়ে উপর থেকে ঢেলে দেওয়া মগভর্তি চা নিয়ে ঘরে ফিরে। চা-পরোটা ভাগবাটোয়ারা হয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। উঠানের কোনায় শূকর জবাই হয়। দাম চুকিয়ে এক কেজি, দু'কেজি মাংস ঘরে তোলে প্রতিটি পরিবার। সকালটা তেজি হয়ে উঠলে মদ নিয়ে বসে পুরুষেরা—এককভাবে, সামষ্টিকভাবে। পট্টিতে পট্টিতে হল্লা বাড়ে। গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে থাকে রান্নাঘরগুলো থেকে। বাচ্চা-কাচ্চারা লুটোপুটি খেতে থাকে উঠানে, বারান্দায়। ঝগড়া হতে থাকে দুই নারীতে। তৃতীয়া এসে ঝগড়া মিটাতে থাকে। নারীরা বাজারে যায়—আজ একটু ভালো খেতে হবে, খাওয়াতে হবে স্বজনদের।

কিন্তু আজকের শুক্রবারটা অন্যরকম—অন্তত ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে। মন্দির জুড়ে সাজ সাজ রব। আজ সর্দার নির্বাচন হবে এখানে। সর্দার গুরুচরণ ঘোষণা করেছে—সর্দারি ছেড়ে দেবে আজ। স্বেচ্ছায়। কিন্তু হরিজনপল্লী সর্দারশূন্য থাকে না কখনো। তাই যেদিন গুরুচরণ সর্দারি ছাড়বে, সেদিনই নির্বাচন করতে হবে আরেকজন সর্দার।

সর্দাররা সহজে ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। বয়সের ভারে চাকরি ছাড়ে, কিন্তু সর্দারি ছাড়ে না। পট্টির নিয়ম—স্বেচ্ছাচারি না হলে কোনো সর্দার আজীবন সর্দার থাকতে পারবে। জরায় আক্রান্ত হয়ে কোনো সর্দার কর্ম-অক্ষম হয়ে পড়লে চার পট্টির মেথররা নতুন সর্দার নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। নির্বাচন মানে আক্ষরিক অর্থে নির্বাচন নয়। পট্টির মানুষেরা মৌখিক সমর্থনের মাধ্যমে তাদের পরবর্তী সর্দার ঠিক করে। গুরুচরণ বার্ধক্যে বা জরায় ন্যুব্জ হয়ে পড়ে নি। চলৎশক্তি হারায় নি সে। মস্তিষ্ক এখনো সচল তার। কিন্তু নিজের ভেতরে সে যখন চোখ রাখে—তখন কমজোর মনে হয় নিজেকে। আগের গুরুচরণকে খুঁজে পায় না সেখানে। সাহস যেন অনেক কম সেখানে। একসময় দুর্বার শক্তি খেলা করত বুকে। আসুরিক শক্তি ছিল শরীরে। ইদানীং এসব কিছুর অভাব—শরীরে ও মনে। তাই সে ঠিক করেছে—আর না। তার জায়গায় নতুন কেউ আসা দরকার। মেথরপট্টির হালধরা দরকার নতুন কাউকে। সামর্থ্যবান কারও হাতে সর্দারি তুলে দিতে চায় সে। সর্দারি ছেড়ে দেবার এটাই কি মূল কারণ ? অন্য কোনো বাসনা কি গুরুচরণের মনে কাজ করছে না। হ্যাঁ করছে। গুরুচরণ ভাবে—সত্যি তার মনের ভেতর অন্য একটি বাসনা ওলটপালট খায়। যদি তার পরিবর্তে রামগোলামকে সর্দার করা যায় ? রামগোলাম বুদ্ধিমান, লেখাপড়াও জানা তার। সর্দারের নাতি সে। তবে তাকে সর্দার নির্বাচন করতে আপত্তি কোথায় ? আপত্তি এক জায়গায়—বয়সে নবীন রামগোলাম। মেথর সমাজে সর্দার হবার জন্য প্রবীণতাও একটা শর্ত। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত রামগোলামের ক্ষেত্রে প্রবীণতার শর্তকে কি শিথিল করা যায় না ? গত কয়েক রাত ধরে এরকম এলোমেলো ভেবেছে গুরুচরণ।

বাবাঠাকুরকে ঘিরে চার পট্টির মানুষেরা বসেছে। সর্দার, মুখ্য, গণ্যমান্যরা। তরুণ আর সাধারণ মানের বয়সেরা একটু দূরে; কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। তাদের ছাড়িয়ে ওদিকে উৎসুক নারীরা। সবার দৃষ্টি সভার মাঝখানে নিবদ্ধ।

গুরুচরণ গলায় গামছা জড়িয়ে উপুড় হয়ে সভায় প্রণাম করল। করজোরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আজ স্বেচ্ছায় সর্দারি ছেড়ে দিলাম। আপনারা আমার জায়গায় নতুন সর্দার নির্বাচন করেন।'

গুরুচরণের স্বেচ্ছায় সর্দারি ত্যাগ করার ব্যাপারটি মেথরপট্টির সবার কমবেশি জানা। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে হরিজনদের মধ্যে। সবার কথা একটি জিজ্ঞাসায় এসে ঠেকেছে কে হবে পরবর্তী সর্দার ? গুরুচরণের এ ঘোষণায় সবার মধ্যে ওই কথাটি আবার গুঞ্জরিত হতে লাগল—গুরুচরণের পর কে হাল ধরবে মেথরসমাজের ? তার মতো বুকের পাটা কার আছে ? কে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে হরিজন সমাজের জন্য লড়বে ? অসহায় অসুস্থ মেথরদের নিয়ে গভীর রাতে কে ছুটবে হাসপাতালের দিকে ?

'সর্দার গুরুচরণের জায়গায় মনুলালকে সর্দার করার প্রস্তাব করছি আমি।' সমবেত মুখ্যদের মধ্য থেকে যোগেশ বলল।

কার্তিক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'আমি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। শুধু বিরোধিতা নয়, নিন্দাও জানাচ্ছি এ রকম প্রস্তাব দেওয়ার জন্য।'

যোগেশ বলল, 'বিরোধিতার কী আছে ? মনুলাল কম কিসে ? টাকাপয়সার অভাব আছে নাকি তার ?'

'তার মধ্যে নীতির অভাব আছে। খুনি লম্পটকে ঘরে আশ্রয় দেয়। মদ ভাঙ নিয়ে হরদম পড়ে থাকে ভাটিখানায়। আর টাকাপয়সার কথা বলা হচ্ছে। সমবেত মানুষদের মধ্যে কে বলবে—মনুলাল কাউকে টাকাপয়সা দিয়ে বিপদে সাহায্য করেছে ? বরং তার ঘরে আশ্রিত কুলাঙ্গার রূপালিকে বলৎকার করতে চেয়েছে।' কার্তিক বলল।

মনুলালের ডান হাত উরুর ওপর ছড়ানো। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ। ধীরে ধীরে খুলে যায় মুষ্ঠি। ডান উরুতে জোরে একটা থাপ্পর মেরে প্রায় চিৎকার করে মনুলাল বলে, 'অনেক বেড়ে গেছস কার্তিক তুই। দাম চুকাতে হবে তোকে অনেক।'

কার্তিক বলে, 'কী দাম দিতে হবে তোমাকে ? মাথা কাটবে আমার ? তুমি আর যোগেশকে কে না চিনে ? তোমরা হরিজন সমাজের শত্রু।'

চেদিলাল কার্তিককে থামিয়ে বলে, 'আমরা কি এ মন্দিরে ঝগড়া করার জন্য জমায়েত হয়েছি ? আজ আমাদের সর্দারের শেষ দিন। কোথায় তাকে সেলাম জানাব—তা না। একে অপরের দুর্নাম ছড়াতে ব্যস্ত আমরা। আমি উভয়পক্ষকে অনুরোধ করছি, আর কাদা ছোড়াছুড়ি নয়। আমরা আমাদের নেতা নির্বাচনে মনোযোগ দিলে ভালো হবে।'

বাবাঠাকুর এতক্ষণে কথা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ চেদিলাল। যোগেশের প্রস্তাবের বিপরীতে কারও কোনো প্রস্তাব আছে কি না ?'

'হ্যাঁ আছে।' বাণ্ডেলের অশীতিপর বৃদ্ধ গণেশ কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে গেছেন তিনি। সর্দার নির্বাচনের কথা শুনে লাঠিতে ভর দিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মন্দির চত্বরে।

সবাই প্রায় একযোগে তাকাল তাঁর দিকে। বাবাঠাকুর বললেন, 'কী প্রস্তাব গণেশদা ?'

'আমার প্রস্তাব হলো—রামগোলাম হোক আমাদের পরবর্তী সর্দার। শিক্ষিত। বুদ্ধি রাখে সে। কিছুদিন ধরে তাকে আমি চিনছি। পট্টিতে পট্টিতে ঘুরে হরিজনদের অতীত সম্পর্কে জানতে চায়। আমার কাছে গেছে অনেকবার। আমার মনে হয়েছে—রামগোলামই সর্দার হবার যোগ্যতা রাখে। বয়স কম তার, অভিজ্ঞতা বেশি। রামগোলামই হোক আমাদের পরবর্তী সর্দার।' শ্বাস টেনে টেনে শ্লথকণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন গণেশ।

বাবাঠাকুরের চোখেমুখে প্রশান্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, 'গণেশের প্রস্তাবকে কারা কারা সমর্থন করো ?'

সমবেত জনগোষ্ঠী সমস্বরে বলল, 'রামগোলামই আমাদের সর্দার হোক।'

মনুলাল ও যোগেশ সভা ত্যাগ করল। কার্তিকরা প্রায় কোলে করে রামগোলামকে নিয়ে এল বাবাঠাকুরের সামনে। বাবাঠাকুর মা কালীর চরণ থেকে সিন্দুর নিয়ে রামগোলামের কপালে লাগিয়ে দিলেন। রামগোলামের মাথায় হাত রেখে বাবাঠাকুর বললেন, 'এত অল্প বয়সে কেউ হরিজন পল্লীর সর্দার হতে পারে নি। তুমি পেরেছ। কারণ হরিজনরা বিশ্বাস করেছে, গুরুচরণের দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা তোমার আছে। গুরুচরণ লেখাপড়া জানত না। ফলে কর্পোরেশনের কর্তাদের সঙ্গে যুক্তিতে আর বুদ্ধিতে পেরে উঠত না। নানা মারপ্যাঁচে জড়িয়ে তাকে দাবিয়ে রাখত তারা। সর্দারকে দাবিয়ে রাখা মানে পট্টির সবাইকে দাবিয়ে রাখা। তা ছাড়া আমাদের মধ্য থেকে সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বারবার। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা আর গুরুচরণের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ওইসব কর্মকর্তারা আমাদের দাবিদাওয়াকে অগ্রাহ্য করেছে বা মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে। সে দাবিগুলো ছিল ছোট ছোট। .... গর্ভবতী মা'দের পুরো দুই মাস ছুটি দেওয়া, শুক্রবারের বেতন দেওয়া, জমাদারদের জাত তুলে গালি দেওয়া বন্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু এবারের দাবি অনেক বড় এবং জটিল। হরিজন ছাড়া অন্য জাতের মানুষদের এই চাকরিতে বহাল করার নোটিশ জারি করেছে কর্পোরেশন।'

কার্তিক বলল, 'শুধু নোটিশ জারি না, নোটিশ মোতাবেক আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানির ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে কর্পোরেশন।'

বাবাঠাকুর কার্তিকের কথায় কান না দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, 'তোমার ওপর অনেক ভরসা হরিজনদের। গুরুচরণের শুরু করা কাজকে তুমি সফল করে তুলবে—এই আশা করে তারা। তুমি হরিজনদের ভুলো না, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আর হ্যাঁ, তোমার দাদা শত্রুহীন ছিল। অন্তত এই সমাজের কোনো মানুষ তার বিরোধিতা করত না। কিন্তু তুমি শত্রুশূন্য নও। তুমি নিজের চোখেই দেখলে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলল কারা। তোমাকে সজাগ থাকতে হবে।' রামগোলাম কোনো কথা বলল না, নীরবে শুনে গেল বাবাঠাকুরের কথা। গুরুচরণ বলল, 'বাবাঠাকুর, রামগোলামকে আপনি আশীর্বাদ করুন সে যেন হরিজনদের আশা পূরণ করতে পারে।'

গুরুচরণের আজ ত্যাগের দিন আবার প্রাপ্তিরও দিন। সর্দারি ত্যাগ করেছে সে আজ, কিন্তু রামগোলামকে সর্দার নির্বাচন করেছে হরিজন সমাজ। ত্যাগ এবং প্রাপ্তি গুরুচরণে এসে সমাহিত হয়ে গেছে। ত্যাগের বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দ মিলেমিশে গুরুচরণের মুখমণ্ডলে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

গুরুচরণের চাকরি শেষ হবার দিন দশেক আগে রামগোলামের চাকরি হয়ে গেল কর্পোরেশনে। জুনিয়র জমাদারের চাকরি। হরিজনরা বলল, রামগোলাম এখন থেকে আমাদের ছোট জমাদার। হারাধন বাবুই ডেকে বলেছিল কথাটা, 'কী গুরুচরণ, বড় সাহেব কথা একটা বলেছিল তোমাকে, এ বিষয়ে কিছু তো বললে না।'

গুরুচরণের মনে থৈ থৈ আনন্দ। নাতি সর্দার নির্বাচিত হওয়ায় তার আনন্দের সীমা নেই। অঞ্জলি আনন্দে বিভোর। একাধারে সর্দারের স্ত্রী আর ঠাকুমা হতে পেরে খুশিতে ডগমগ সে। আনন্দে নিমগ্ন থাকার কারণে বড় সাহেবের প্রস্তাবের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল গুরুচরণ। তাই জমাদার হারাধনবাবুর কথার মর্মার্থ প্রথমে বুঝতে পারে নি গুরুচরণ। বলেছিল, 'কী কথা জমাদারবাবু? কোন ব্যাপারে কথা বলছেন?'

হারাধনবাবু বললেন, 'এর মধ্যে ভুলে গেলে? শুনেছি—নাতি সর্দার নির্বাচিত হয়েছে; মনে আনন্দ তোমার। ভাতঘরের কথাও মনে রাখা দরকার তোমার।' মনে মনে বলল, 'শালার পো মেথরের বাচ্চা, খুশির ঠেলায় স্মৃতি তোর লোপ পেয়েছে। ভাতের হাঁড়িতে যখন আগুন জ্বলবে না, তখন বাপ বাপ করে দৌড়ে আসবি, পায়ে পায়ে ঘুরবি গু-মুত টানার চাকরির জন্য।' প্রকাশ্যে বললেন, 'রামগোলামের চাকরির কথা বলছি। শুন গুরুচরণ, তোমাদের চাকরির জন্য ক-ত মানুষ যে ধরনা দিচ্ছে—নিজ চোখেই তো দেখছ। বড় সাহেব তোমাকে ভালোবাসেন, তাই সেধে তোমার নাতিকে চাকরিটা দিতে চাইছেন। তাও আবার যেই সেই চাকরি না, একেবারে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র জমাদারের চাকরি। আর তুমি জিজ্ঞেস করছ—কী কথা জমাদারবাবু।'

লজ্জিত গলায় গুরুচরণ বলল, 'ভুল হয়ে গেছে হুজুর। আপনি ঠিকই ধরেছেন—খুশিতে মশগুল ছিলাম—বড়বাবুর দয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।' একটু থেমে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কখন নিয়ে আসব হুজুর রামগোলামকে?'

'কালকে নিয়ে আস, কালকেই নিয়ে আস।' একদলা কফ থু করে মাটিতে ফেলে হারাধনবাবু বললেন, 'আমি বড় সাহেবকে বলে রাখব।'

গুরুচরণ দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে আনন্দিত কণ্ঠে বলল, 'আপনার বহুত মেহেরবানি হুজুর।'

হারাধন বাবু মনে মনে বললেন, 'আগে খাঁচায় ঢুক ইন্দুরের বাচ্চা, তারপর দেখ কী করি। ভেতরে শুঁটকি মাছ গেঁথে ইন্দুরের কল বসাতে দেখস নাই? কলে ঢুইক্যা মাছে টান দিলেই ঝপাস কইরা দরজা বন্ধ। তারপর ইন্দুরটার কী হাল হয় দেখস নাই? না দেখলে দেখাইয়া দিমু নে।' তারপর মুখে কপট হাসি ছড়িয়ে বলল, 'তো এই কথা, কালকে নিয়ে এস রামগোলামকে।'

'জি আচ্ছা, হুজুর।' গুরুচরণ কোঁতা হয়ে বলে।

পরের দিন রামগোলামকে নিয়ে আবদুস ছালাম সাহেবের রুমে হাজির হলো গুরুচরণ। সঙ্গে কার্তিক আর চেদিলাল। আগে থেকেই সেখানে হাজির ছিলেন হারাধন জমাদার। অফিসের বাইরে ঘুরঘুর করতে দেখা গেল যোগেশকে। বড় সাহেবের রুমে ঢুকতে আজ বাধা দিল না ইউসুফ। রামগোলামকে দেখেই বড় সাহেব বলে উঠলেন, 'আরে আস আস গুরুচরণ, রামগোলামকে নেতা বানিয়েছ শুনলাম। আমার পক্ষ থেকে তো রামগোলামকে একটা তোফা দেওয়া দরকার।' হারাধন বাবুর দিকে তাকিয়ে চোখকে একটু ছোট করে, গলায় অপ্রয়োজনীয় উল্লাসের সঞ্চার করে আবদুস ছালাম আবার বললেন, 'হারাধনবাবু, রামগোলামের যোগদানের ব্যবস্থা করেছেন তো?'

'স্যার সবকিছু রেডি আছে। আপনি হেড ক্লার্ককে বলে দিলে হবে।' হারাধন বাবু বললেন।

আবদুস ছালাম খুশি খুশি ভাব করে রামগোলামকে বললেন, 'তো রামগোলাম, আজ থেকে তুমি আমাদের কর্মচারী হয়ে গেলে। কর্মচারীদের কিছু দায়িত্ব আছে। হারাধনবাবুর কাছে ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে। গুরুচরণ, রামগোলামকে হেড ক্লার্কের কাছে নিয়ে যাও। উনি সব ব্যবস্থা করবেন।'

সেইদিনই রামগোলাম জুনিয়র জমাদার পদে যোগদান করল।

৭

যেদিন গুরুচরণ মারা গেল, সেদিন খুব করে কাঁদল রামগোলাম। অব্যক্ত এক আবেগ তার ভেতরে গুমরে গুমরে মরছিল। সে আবেগের নাম হয়তো বেদনা অথবা শ্রদ্ধা অথবা নির্ভরশীলতা। বোঝার বয়স হবার পর থেকে রামগোলাম যাকে সবচেয়ে কাছে পেয়েছিল, সে গুরুচরণ। মা-বাবাকে দেখে দেখে পাড়া-পড়শির কাছে শুনে শুনে দাদু সম্পর্কে একটা ভীতির ব্যাপার তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন দাদুর সঙ্গে তার নামের ব্যাপারে কথা হলো, সেদিনই দাদু সম্পর্কে তার ভয়টা কেটে গেল। সেদিন সে দেখল—কালাপাহাড়ের মতো বিশাল দাদুও হা হা করে হাসে, পরম স্নেহে কাছে টেনে নেয়। দাদুর সঙ্গে কথা বলে সেদিনই তার মনে হয়েছে—দাদু তার ঝুনা নারকেলের মতো। ঝুনা নারকেলের বাইরে শক্ত আচরণ, তার নিচে কঠিন মালা। তারপর শাঁস, জল। যারা নারকেলের শাঁস আর জল পেতে চায়, তাদের ওইসব কঠিন স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। কঠোর গম্ভীর দাদুর ভেতরও ঝুনা নারকেলের মতো স্নেহের ফল্গুধারা। অন্যেরা না চিনুক, রামগোলাম সেই বালক বয়সে দাদুর আপাত কঠিন আচরণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কোমল মানুষটিকে চিনতে পেরেছিল। সেই থেকে রামগোলাম নিজের মধ্যে গুরুচরণের জন্য একটা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল। রামগোলামের এই বিশ্বাস যে, পৃথিবীর সেরা মানুষদের একজন তার দাদু। মা-বাবা-ঠাকুমার কাছ থেকে সে ধীরে ধীরে দাদুর কাছে সরে এসেছিল। তার কাছে দাদু গুরুচরণ এক পরম নির্ভরতার জায়গা হয়ে

গিয়েছিল। শ্রদ্ধাজনিত নির্ভরতার এই স্থানটি যেদিন ঈশ্বর কেড়ে নিল, সেদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল রামগোলাম। পাড়াপড়শিরা কোনো ক্রমেই থামাকে পারছিল না তাকে। অশ্রু তার দু'চোখকে ঘিরে ধরছিল বারবার। থরথর করে কাঁপছিল তার দেহ। তার বিচূর্ণ হতে থাকার ব্যাপারটি দেখে ঠাকুমা অঞ্জলি নিজের আবেগকে দাবিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছিল। ডানহাতটি রামগোলামের মাথায় রেখে বলেছিল, 'নিজেকে দমন করো রাম। সবাই যায়, যাবে। জগতের নিয়ম মেনে তোমার দাদুও চলে গেল। তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।' বলেই হু হু করে কেঁদে উঠল অঞ্জলি। তার কান্না দেখে চাঁপারানী এগিয়ে এল। নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিল শাশুড়িকে।

ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে তখন অনেক মানুষ। চার পট্টির আবালবৃদ্ধবনিতা আছড়ে পড়েছে ফিরিঙ্গিবাজার পট্টিতে। সবার চোখে জল, মুখে হাহাকার, বুকে অপার বেদনা। এই হাহাকার আহাজারির মধ্যেও কিছু মানুষ গুরুচরণের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। পাতি বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করা হয়েছে। বিছানার পাটিসহ শবটি সেই মাচার ওপর রাখা হয়েছে মন্দির চত্বরে। গুরুচরণের পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে হরিজনরা প্রণাম করছে। শিয়রের কাছে ধূপকাঠি-মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। বাবাঠাকুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন গুরুচরণের মাথার কাছে। তাঁর দুচোখ শুকনা।

একটা সময়ে হরিজনরা তাদের প্রিয় মানুষটির নিথর দেহ নিয়ে ভলুয়ার দীঘির শ্মশানে উপস্থিত হলো। স্নানাদি সম্পন্ন হবার পর দেহটি পোড়ানোর জায়গায় নিয়ে গেলে বাধ সাধল রামদাস। রামদাস এই শ্মশানের ডোম। মরা পোড়ানোর দায়দায়িত্ব তাকে দিয়েছে শ্মশান কমিটি। শহরের গণ্যমান্য উঁচু বর্ণের হিন্দুরা এই কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, সদস্য। ওদের অঙ্গুলি হেলনে রামদাস ওঠে বসে, হাসে কাশে। ওরাই তাকে বলে দিয়েছে— মেথর, জেলে, হাঁড়ি এইসব নিচু জাতদের মৃতদেহ পোড়াবে ওই ওদিকে, খালের পাড়ে। আর এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঁধানো চুলাটি উঁচু বর্ণের জন্য। উঁচু বর্ণ মানে—ব্রাহ্মণ, সেন, দাশগুপ্ত, চৌধুরী, দে, মজুমদার ইত্যাদি। খবরদার, এর ব্যতিক্রম করলে চাকরি খাব তোমার। রামদাস ডোম তাদের আদেশকে শিরোধার্য করেছে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সমাজের ওইসব হর্তাকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ। তাই রামদাস বলল, 'তোরা মেথর আছিস। তোদের জায়গা এটা না। এইটা বাবুদের জন্য। তোরা পোড়াবি ওইখানে। আর হ্যাঁ, মরা পোড়ানোর জন্য টেক্স দিতে হোবে, আড়াইশ টাকা।'

বলে কী বেটা রামদাস! এই এত বয়স হলো—কত মরা পোড়াতে এলাম এই শ্মশানে। এইখানেই তো পুড়েছি আমার বাপকে, বউটাকেও তো পুড়িয়ে গেলাম সেদিন। ছয় মাসও তো হয় নি। টেক্সমেক্স কিছুই দিতে হয় নি। রামদাস ডোম বলে কী? এই চুলাতে মরা পোড়ানো যাবে না! আবার আড়াইশ টাকা দাবি! মাথা গরম হয়ে উঠল চেদিলালের। রামদাসকে উদ্দেশ করে বলল, 'অই হারামখোর, ক্যায়া কাহা? তুই তো বেটা ডোম আছিস, নিচু জাতের নিচু জাত! তুই আবার বলিস এই চুলা বাবুদের জন্য?'

'হ্যাঁ দাদা, ওরা বলে দিয়েছে শুধু উঁচুজাতের মানুষকে পোড়ানো হোবে এই চুলায়। তোমরা ওই-ই খানে কাদা-ময়লার জায়গাটিতে।' কিছুটা মাতাল কণ্ঠ রামদাসের।

কার্তিক এগিয়ে এল। গলা চড়িয়ে বলল, 'এইখানেই পোড়াব আমাদের সর্দারের মৃতদেহকে। তুই যা করতে পারিস কর দেখি। আর কোন মাদারি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিবে আসতে বল।'

কার্তিকের রণমূর্তি দেখে একটু ভড়কে গেল রামদাস। কিন্তু পিছ হটল না। বলল, 'তোমরা জোর করে পোড়াবে নাকি?'

শিউচরণ স্নান করে নতুন ধুতি পরেছে, গলায় নতুন গামছা। বামুন তার কপালে কণ্ঠায় কানের লতিতে তিলকের ফোঁটা দিয়েছে। বাপের গা ঘেঁসে বসে আছে সে। রামগোলাম দাদুর পায়ের কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কার্তিকের উচ্চকণ্ঠ শুনে সেদিকে এগিয়ে গেল রামগোলাম। কার্তিকের মুখে শুনল সবকিছু। বিষণ্ণ বিপর্যস্ত চেহারা তার। জাতপাত আর চাঁদার কথা শুনে তার মধ্যে হঠাৎ এক প্রবল প্রতাপী ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হলো। দাদুর মৃত্যু-বেদনা তার মধ্য থেকে তিরোহিত হয়ে গেল, সেখানে চাগিয়ে উঠল তীব্র এক ক্রোধ। ক্রোধান্ধ রামগোলাম চিৎকার করে বলল, 'আমরা তোমার বাবুদের চুলায় আমার দাদুকে পোড়াব।'

'আমি পোড়াতে দেব না।' পাশ থেকে একটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে তেড়ে এল রামদাস।

'তোমরা সবাই বাঁধ ওকে ওই গাছে। কষে বাঁধ।' আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল রামগোলাম। অনেকক্ষণ কাঁদল সে। তারপর মাথাটা সোজা করল। দেখল—তার চারপাশে শ্মশানে আগত হরিজনরা দাঁড়িয়ে আছে। সবাই চুপচাপ। রামদাসও জবুথবু ভঙ্গিতে রামগোলামের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময় আর ভয়ের মেশামেশি। মদের ঘোর কেটে গেছে তার। রামগোলাম বলল, 'জীবনে এই বাবুদের অত্যাচার থেকে, ঘৃণা থেকে মুক্তি নেই আমাদের। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ সবাই আমাদের এড়িয়ে চলে। পথ চলতে চলতে ছোট ছোট সন্তানদের আমাদের দেখিয়ে বুঝায়—ওই যে দেখছ রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে যারা, ময়লা-আবর্জনা টুকরিতে করে ট্রাকে তুলছে যারা, তারা কিন্তু মানুষ না মেথর। মেথরদের ছুঁলে পাপ। গরু-ছাগল-কুত্তাকে ছোঁয়া যায়, মেথরদের ছোঁয়া যায় না। খবরদার তোমরা এদের থেকে দূরে থাকবে। সেই থেকে আমাদের ঘৃণা করা শুরু। সেই ঘৃণা থেকে আমাদের মুক্তির কোনো দরজাই খোলা নেই।'

কার্তিক বলল, 'থাক সর্দার থাক। ওগুলো আর ভাবতে নেই।'

'আমি তো ভাবতে চাই নি। ভাবতে বাধ্য করছে ওই বাবুরা। ভাবতে বাধ্য করছে ওই রামদাস ডোম। রামদাস নিজেই জানে না সে কে? তাকে যে উঁচুজাতের মানুষেরা গুয়ের পোকার চেয়েও বেশি ঘৃণা করে তা সে জানে না। মদে বেহেড হয়ে থাকে সে। ও যে নিজের মানুষদের মাথায় লাঠি মারছে—সেটা সে বুঝে না।'

'বুঝলে কি বাধা দিত? তোমরা ভেবে দেখ, জীবনে যাদের হাতে আমরা লাঞ্ছিত হই, মরণেও তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। শ্মশানেও জাতিভেদ। ওদের বড় বড় মুনিঋষিরা বলে গেছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাকি সমান হয়ে যায়, যখন ওরা শ্মশানে আসে। মৃতের নাকি কোনো জাত নেই। কিন্তু তোমরা দেখ, এখানেও তারা জাতপাতের গেঁড়াকল পেতে রেখেছে। মানি না বাবুদের চালাকি, ঘৃণা করি আমরা তোমাদের করা জাতভাগকে।' বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে রামগোলাম।

রামদাস বলে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে দাদা। আমি বাবুদের চালাকি বুঝি নি।'

রামগোলাম বলল, 'শুন রামদাস, বাবুদের চুলায় দাদুকে পোড়াব। তোমাকে গাছে বেঁধে রাখব আমরা। না হলে তোমার চাকরি যাবে। বউ-পোলা উপুস থাকবে। চাঁদা আমরা তোমাকে দেব না। বাবুরা জিজ্ঞেস করলে বলবে—হরিজনরা তোমাদের আদেশ মানে নি।'

বাবুদের চুলায় মেথর সর্দার গুরুচরণকে পুড়িয়ে ঘরে ফিরল হরিজনরা।

শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে শুয়েছে আজ চাঁপারানী। শিউচরণ শুয়েছে রান্নাঘরে। অঞ্জলি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। অথচ আজ তার ঘুম আসার কথা না। কবে সেই বারো-তের বছর বয়সে গুরুচরণের ঘরে এসেছিল অঞ্জলি। বিয়ে, স্বামী—এসব বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা ছিল না অঞ্জলির। বৌদিদের কাছে শুনে শুনে যা কিছু জানা। বিয়ের সময় ভীমাকৃতির গুরুচরণকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন বিকেলে মেজবৌদি কানে কানে বলেছিল—'দেখিস সর্দারকে বিছানায় খালি গায়ে দেখে ভয় পাস না যেন। এরপরে মধু আছে।' বৌদির অসভ্যতা সেই বিকেলে ভালো করে বুঝে উঠতে পারে নি অঞ্জলি। বুঝল—আঁধারঘরে গুরুচরণ তাকে যখন বুকে টেনে নিল, আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিল তার দেহ আর মন। সেই থেকে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা গেল, কত সুদিন-কুদিন গেল, কত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কাটল। একটি দিনের জন্যও কাছ ছাড়া হয় নি সর্দার। অথচ আজ অঞ্জলিকে একা রেখে কোন অজানা দেশে যে পাড়ি জমাল! ভাবতে ভাবতে একটা সময়ে অঘোর ঘুমের দেশে চলে গেছে অঞ্জলি।

ঘুম আসছে না শুধু চাঁপারানীর চোখে। গুরুচরণ তার শ্বশুর ছিল না, বাবা ছিল। অসীম মমতায় ঘিরে রেখেছিল তাকে। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে চাঁপারানীকে ছেলের বউ করে এনেছিল ঘরে। বাৎসল্যের সবটুকু চাঁপারানীকে দিয়ে দিয়েছিল গুরুচরণ। আসতে যেতে মা মা। রামগোলাম জন্মাবার পর কোনোদিন বৌমা ডাকে নি তাকে, ডেকেছে রামগোলামের মা বলে। অঞ্জলি এ নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করেছে সর্দারজীর সঙ্গে। বলেছে, 'কই, কোনোদিন তো আমাকে শিউচরণের মা বলে ডাকলে না, কেবল অঞ্জলি অঞ্জলি। আর বাউয়ের ক্ষেত্রে অ রামগোলামের মা, কোথায় গেলে!' কপট অভিমান অঞ্জলির কণ্ঠে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবকথা শুনছিল চাঁপারানী। অঞ্জলির অভিযোগে হো হো করে হেসে উঠেছিল শ্বশুরজী। উত্তরে বলেছিল, 'ও এই কথা। তোমাকে নাম ধরে ডাকি, ডাকতে ভালো লাগে বলে। আর বৌকে রামগোলামের মা বলে ডাকি অন্য একটা কারণে।'

'কী কারণ?'

'রাম আমাদের হনুমানজীর দেওতা। রামের জন্য জানবাজি রেখে লঙ্কায় গিয়েছিল হনুমানজী, লেজের আগুনে লঙ্কা পুড়িয়েছিল। এমনকি ছদ্মবেশে মন্দোদরির কাছে গিয়ে রাবণের জানকবচের মৃত্যুশেল নিয়ে এসেছিল। এই রাম দেওতার আশীর্বাদে হনুমানজী অমর হলো এই পৃথিবীতে। আমাদের ধর্মমতে যে দশজন অবতার আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রাম। তাঁর নাম নিলে অনেক পুণ্য হয়। নাতির নাম ধরলে তো দেওতার নামও ধরা হয়, তাই ওই নামে ডাকি বৌমাকে।' গুরুচরণ বলে।

এবার মুখে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে অঞ্জলির। বলে, 'শুধু কি এটাই কারণ?'

গুরুচরণ আমতা আমতা করে বলে, 'নন না, আরও একটা কারণ আছে।'

'শুনতে চাই সেই কারণটা কী?'

গুরুচরণ বলে, 'রামগোলামকে যে আমি খুব ভালোবাসি। সে জন্মাবার পর আমার বুকটা ভরে গিয়েছিল। শিউচরণের মধ্যে কিছু খামতি আছে। শিউচরণের ম্যাড়ম্যাড়া ভাব আমার ভালো লাগে না। রাম জন্মাবার পর থেকে আমার কেন জানি মনে হয়েছিল—সে কিছু একটা হবে। যাক সে কথা। আদরের মানুষটির নাম মুখে মুখে রাখতে কে না ভালোবাসে, বল? রামের নাম ধরবার জন্যই তো বৌমাকে রামগোলামের মা বলে ডাকি।'

সেদিন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করেছিল চাঁপারানীর। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে ওখান থেকে সরে গিয়েছিল সে।

আরেক দুপুরের কথা মনে পড়ে চাঁপারানীর। শ্রাবণ মাস ছিল। সকালে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছিল। ওই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল শ্বশুরজী। চার-চারটা ফজলি আম নিয়ে ফিরেছিল সেই দুপুরে। বৃষ্টি অনেকটা ধরে এসেছে তখন। একটু আগুপিছু সময়ে শিউচরণ আর অঞ্জলিও ফিরেছিল। ওদেরই সামনে সবচেয়ে বড় আমটি কেটে চিৎকার করে বলেছিল, 'রামগোলামের মা কোথায় গেলে!'

চাঁপারানী কাছে এলে নিজের পাশের খাটিয়া দেখিয়ে বলেছিল, 'বস, এইখানে বস।'

জড়সড় চাঁপারানী কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তার ইতস্তত ভাব দেখে গুরুচরণ আবার বলেছিল, 'বসতে বললাম না তোমাকে! বস, আমার পাশে বস।'

চাঁপারানী সংকোচে পাশে বসলে থালাভর্তি আম এগিয়ে দিয়েছিল তার দিকে। বলেছিল, 'খাও, খাও মা। গরিব আমরা। সবসময় ভালো ফলটল আনতে পারি না। আজ ডিউটি পড়েছিল রেয়াজুদ্দিন বাজারের মুখে। ওখানে দোকানে আম দেখে তোমার কথা মনে পড়ল মা।'

চাঁপারানী কী করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। লোহার মতো কঠিন একটা মানুষের একী আচরণ! বিশ্বাসই করতে পারছিল না সে।

শিউচরণ স্নান করতে গেছে। অঞ্জলিকেও ডেকে পাশে বসিয়েছিল গুরুচরণ। বলেছিল, 'তুমিও খাও অঞ্জলি। আম দেখে রামগোলামের মায়ের কথা মনে পড়ল, তিন সের আম এনেছি। খাও তুমি খাও।'

আজ এই নিষ্প্রাণ রাত্রিতে বারবার ওই আম খাওয়ানোর দৃশ্যটি ঘুরেফিরে ভেসে উঠছে চাঁপারানীর খোলা চোখে। চিৎ হয়ে শুয়েছিল সে। দু'চোখের কোনা বেয়ে কখন জল গড়িয়ে বালিশ ভিজে গিয়েছিল টের পায় নি চাঁপারানী। 'ও মারে।' বলে পাশ ফিরে শুয়েছিল অঞ্জলি। শাশুড়ির আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এসেছিল চাঁপারানী।

গুরুচরণের দেহ ভস্ম হতে হতে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল সাঁঝের দিকে। যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। মেয়েরা এসেছিল জামাই-সন্তানদের নিয়ে; কেঁদেছিল হাহাকার করে। তারাও ফিরে গিয়েছিল সাঁঝবেলাতে। বাপের বাড়িতে থাকার জায়গা নেই। তা ছাড়া বাচ্চাদের তো রান্না করে খাওয়াতে হবে।

রামগোলামদের পরিবারে নিরন্নের কাল। পরিবারের কেউ মারা গেলে সেবেলা ভাত রাঁধার নিয়ম নেই হরিজন সমাজে। চুলায় আগুন দিতে নেই। ঘরে যদি রান্না করা কোনো ভাত-তরকারি থাকে, তাও ফেলে দিতে হয়। অশৌচের কাল তখন। বড়রা উপুস দেয় সেবেলা, ছোটদের এ ঘরে ও ঘরে নিয়ে যায় হরিজন নারীরা। ছোটদের খাওয়ায় নিষেধ নেই। বড়দের ক্ষুধা মালুম হয় না। স্বজন হারানোর বেদনা তাদের কুরে কুরে খায় তখন।

দুপুরে খায় নি, আর এত রাত পর্যন্তও যে পেটে দানাপানি পড়ে নি মালুম হয় না রামগোলামের। এখন সে ছাদে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। বাবা-মা আর দাদি ঘরে ঢুকে পড়ার পর ছাদে উঠে এসেছিল রামগোলাম। বারান্দার ছোট্ট ঘরটিতে একদম ভালো লাগছিল না তার। খাটিয়ায় শুয়ে যেদিকে তাকাচ্ছিল শুধু দাদুর কথা মনে পড়ছিল। ঘরটা দাদু প্রথম যেদিন বানাল, সেদিনের স্মৃতি বারবার মনে ভেসে উঠছিল তার। দাদুর কথাগুলো কানে এসে বাজছিল। কার জন্য ঘরটা তৈরি করেছ, জিজ্ঞেস করায় গুরুচরণ বলেছিল, 'নারে পাগলা, দাদির জন্য না। তোমার জন্যই এই ঘর বানিয়েছি। আজ থেকে এই ঘরে তুমি থাকবে। পড়বে, শোবে।'

আজ দাদুর বানানো ঘরে রামগোলাম শুয়ে আছে, দাদু নেই। মেথরপট্টিতে কোনো মানুষের একা থাকবার জন্য আলাদা ঘর আছে—এটা ভাবনারও অতীত। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল দাদু। নাতিকে একটা ঘরের মালিক করে দিয়েছিল গুরুচরণ। কী অসম্ভব আনন্দ যে লেগেছিল সেদিন! প্রথম রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রামগোলাম শুধু এপাশ-ওপাশ করেছিল। আনন্দের আতিশয্যে ঘুম আসে নি, গভীর রাত পর্যন্ত। মাঝে মাঝে দাদু ঘরে ঢুকে মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে রামগোলামকে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন লাগছে রাম? একা একা ভয় করছে না তো?'

রামগোলাম শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসত, মুখে কিছু বলত না।

একটা সময়ে রামগোলামের ঘরটা অসহ্য হয়ে উঠল। ঘরের চারদিক থেকে দাদুর স্মৃতি বারবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। স্মৃতির তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে; একধাপ, দুধাপ করে করে ছাদে উঠে এল রামগোলাম। ছাদের পূর্বধারে বড় বড় পানির ট্যাঙ্ক। পশ্চিম পাশটা খোলা। দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না তার। পরিষ্কার মতন জায়গা দেখে শুয়ে পড়ল সে।

হেমন্তকাল হবেটবে বোধহয়। ওই তো সেদিন মনসাপূজা হলো। শ্রাবণ মাসের শেষ দিনেই তো মনসা পূজা হয়। শ্রাবণের পরেই তো ভাদ্র। আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, বর্ষার পর তো শরৎ। শরতের আকাশে ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ, কালো নয়– সাদা। কাশফুলের মতো। কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ে সারি সারি কাশফুল, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে মাথা দোলায়। সেদিন স্কুল থেকে একটা কবিতা মুখস্থ করে ফিরেছিল রামগোলাম। তাদের ক্লাসে বাংলা পড়াতেন কুতুবুদ্দীন স্যার। সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি পড়ালেন। পড়ানো শুরু করার আগে বললেন, 'নদী তো তোমরা চিন। ওই যে আমাদের পাশের নদী কর্ণফুলী। কী সোন্দর হানি তার। আঁকি বাঁকি চইলছে বঙ্গসাগরের দিকে। অহন বাদলা দিন। কর্ণফুলী টইটম্বুর জলে। এইডারে কয় ভরা যৌবন। কিন্তু বর্ষাকাল চলি গেলে হানি থাকে না নদীতে। আমাগো বড় কবি রবীন্দ্রনাথ জল নাই এমন একটা নদীরে লই এই কবিতাখানা লিখেছেন। কী অসম্ভব সোন্দর বিবরণ দেখ নদীটির। তারপর তিনি পড়তে শুরু করলেন—

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি।
চিক চিক করে বালি কোথা নাই কাদা,
দুই ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

'কাশফুল দেইখছ নি তোমরা? কেমনে দেইখবা? শউরগা পোলাপাইন। শুধু পেলাস্টিকের ফুল দেইখছ। শিমুল ফুল, মান্দার গাছের ফুল কোনোদিন দেখনি তোমরা।' বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেলেন কুতুবুদ্দীন। আপন মনে বলতে লাগলেন, 'আহারে, আঙ্গ বাড়ির ঘাটার আগায় কী সোন্দর একখানা মান্দার গাছ আছিল। শীতকালের আগে আগে করি হেই গাছে বোঝাই বোঝাই ফুল ধইত্তো। টুনটুনি পাখি, ভাউত্যা মনা মান্দার গাছের এই ডালত্তোন ওই ডালে যাইতো। আঙ্গ বাড়ির পাশে আছিল হিন্দুপাড়া। হেরা সকালে মান্দারফুল লই যাইতো। গোবররে গোল্লা করি করি ঘাটার আগায় থুইতো। হেই গোবরের গোল্লার ওপরে মান্দার ফুল গাঁথি গাঁথি দিত। হেরা বইলতো– দেবতা নাকি খুশি অয় এই রকম করি ফুল দিলে।'

গেছনের বেঞ্চে বসা ছালামত দুষ্ট প্রকৃতির। সে আওয়াজ দেয়, 'স্যায়ার, আমাদের ছোট নদী।' কুতুবুদ্দীন বাস্তবে ফিরে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কী

হড়াচ্ছিলাম যেন তোঙ্গো ?'

'কাশফুল, কাশফুল স্যায়ার।' ছালামতের কণ্ঠে ফাজলামির আভাস। কুতুবুদ্দীন স্যারের সেদিকে খেয়াল নেই। বললেন, 'অ হ্যাঁ, মনে পইড়ছে। কাশফুল দেইখছ নি তোমরা ? কী মনোরম কাশফুল ফুইটতো আঙ্গ বাড়ির ধারের খালের দুই তীরে। তোমরা যারা কাশফুল দেখ নি, তাদের লাগি কইতাছি– কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ে লাখো লাখো সাদা কাশফুল ফুটি রইছে। সুযোগ থাইকলে দেইখ্যা আইস্যো।' এরপর আরও কী কী যেন বলেছিলেন কুতুব স্যার। কিছুই কানে ঢুকে নি রামগোলামের। চোখে শুধু ভাসছিল কাশফুল। কাশফুলের পূর্ণ চেহারা নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারছিল না রামগোলাম। কারণ সে কোনোদিন কাশফুল দেখে নি। কুতুব স্যারের বর্ণনা শুনে তার মধ্যে কাশফুলের একটা অবয়ব তৈরি হচ্ছিল আর ভেঙে যাচ্ছিল। স্কুল ছুটির পর ঘরে ফিরেছিল রামগোলাম। সিঁড়িতেই পেয়ে গিয়েছিল দাদুকে। রামগোলাম জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাশফুল দেখতে কেমন দাদু ? নদীর ওই পাড়ে কিন্তু কাশফুল আছে, কুতুব স্যার বলেছেন। আজকেই নিয়ে চল আমাকে, আমি কাশফুল দেখব।'

সে সন্ধেয় বান্ডেল পট্টিতে একটা জরুরি সালিশ ছিল। কিন্তু নাতির আগ্রহের কাছে সেই সালিশ গুরুত্ব হারাল। গুরুচরণ একটা স্যাম্পান ভাড়া করে রামগোলামকে সাদা সাদা সারি সারি কাশফুল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেই বিকেলে।

আজ এই গভীর রাতে ছাদে শুয়ে আকাশের কাশফুলের মতো সাদা মেঘ দেখে বালকবেলার সেই স্মৃতি মনে ভেসে উঠল রামগোলামের। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভেসে যাচ্ছিল। স্বচ্ছ নীলচে আকাশ। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে। কিন্তু তার আভা ছড়িয়ে আছে গোটা আকাশ জুড়ে। তারারা জ্বলজ্বল করছে আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। দাদু বলত—মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয়ে যায়। সেই তারায় তারায় মানুষের মুখ ভাসে। যাদের চোখ আছে, ওই তারাগুলোর মধ্যে তাদের প্রিয়জনদের মুখ খুঁজে পায়।

রামগোলাম আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবে—তুমিও তো আজকে ওই তারাগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছ দাদু! কোন তারাটি তুমি দাদু ? কত খুঁজছি তোমাকে! একা করে রেখে গেলে আমাকে। এত তাড়াতাড়ি মরলে কেন তুমি ? হরিজনদের দায়ভার তুমি আমার কাঁধে তুলে দিলে। বয়স কম আমার। তারপরও তুমি বললে—রাম, তুমি পারবে। আমি আছি না! তোমাকে বাতলে দেব সব।

কই বাতলে দিলে ? আমার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে ফুরুৎ করে উড়ে গেলে তুমি। হরিজনদের স্বার্থে কুড়াল মারছে এখন কর্পোরেশন। বড় সাহেব বলেছিলেন, হরিজনদের চাকরির ব্যাপারটি দেখবেন। কিন্তু আজ চারমাস পেরিয়ে যেতে চলল। বড় সাহেব কোনো ব্যবস্থা তো নিলেন না। মাঝখানে আমাকে চাকরি দিলেন, জুনিয়র জমাদার করলেন। আমি চাকরি করছি, বেতন পাচ্ছি। হারাধনবাবুকে কয়েকবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ওই এক কথা—পরে হবে, পরে হবে। বড়বাবু এখন নানা ঝামেলায় আছেন। তোমাদের কথা বলেছি আমি তাঁকে। উনি বলছেন—দেখি কী করা যায়! আর রামগোলাম এত তড়পাচ্ছে কেন ? ভদ্রলোকদের চাকরি দিয়েছি আমি তাকে। নিজের চরকায় তেল দিতে বলেন। গুরুচরণ মারা গেছে। রামগোলামের সংসারে তো এখন বেসুমার অভাব। ওর চাকরির কিছু হলে পরিবারটা পথে বসবে, তাকে বুঝিয়ে বলেন হারাধনবাবু।

স্পষ্ট ভয় দেখাচ্ছেন আবদুস ছালাম সাহেব। দাবি-দাওয়া নিয়ে হইচই বাঁধালে চাকরি যাবে রামগোলামের। চাকরি গেলে কী হবে তার ? কিছুই হবে না। বাপ চাকরি করে, দাদি আর মা চাকরি করে। তাদের টাকাতেই সংসার চলে। তার বেতনের টাকা খরচ হয় না। প্রথম মাসের বেতনটা এনে দাদুর হাতেই দিয়েছিল রামগোলাম। পাশে বসা ছিল অঞ্জলি। গুরুচরণ হাতে টাকাগুলো নিয়ে রামগোলামকে উদ্দেশ করে বলেছিল, 'তোমার ঠাকুমার হাতেই তোমার বেতনটা তুলে দিলাম আমি। সামনে থেকে তার হাতেই দিও।'

অঞ্জলি প্রতিবাদ করেছিল, 'মা-বাপকে দিক। সন্তানের বেতনের টাকা মা-বাপ হাতে পেলে খুব খুশি হয়।'

শিউচরণ আর চাঁপারানী হত্যে দিয়ে পড়েছিল অঞ্জলির সামনে, 'তা হবে না মা, রামের বেতন তুমিই নেবে।' সেই থেকে বেতনের টাকা দাদির হাতেই দিয়ে আসছে রামগোলাম। আবদুস ছালাম চাকরি খাওয়ার যতই ভয় দেখান না কেন কিছু আসবে যাবে না রামগোলামের। যাক চাকরি, পরোয়া নেই। তখন বেশি বেশি করে হরিজনদের অধিকার নিয়ে কথা বলা যাবে, আন্দোলন করা যাবে। হরিজনরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর সে তাকিয়ে আছে বড় সাহেব আবদুস ছালামের দিকে। কবে বড় সাহেব বলবেন—তোদের কাকুতি মিনতি আমার মনকে গলিয়ে ফেলেছে রে রামগোলাম। যা আমি আমার আদেশ তুলে নিলাম। ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার চাকরি শুধু তোমাদের হয়েই রইল। ওদের চাকরির অভাব নেই, অফিস-আদালত, স্কুল-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—সবখানেই তো ওদের মানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানের চাকরির সুযোগ আছে। বিদ্যার জোরে বা বুদ্ধির জোরে অথবা মামা-শ্বশুরের জোরে ওরা ওইসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি বাগিয়ে নিতে পারবে। আর তোরা নিজেদের যতই হিন্দু বলে দাবি করিস না কেন, আমি তো জানি উঁচুবর্ণের হিন্দুরা তোদের ক-ত ঘৃণা করে। তোদের তো বিদ্যা নেই তেমন, বুদ্ধি থাকলেও তা মেথরপট্টির চার দেয়ালে মাথা কুটে মরে; আর মদো জাতি তোরা। মদ তোদের বুদ্ধিকে গিলে বসে আছে। তোরা আর যাবি কোথায় ? গু-মুত-আবর্জনা টানার জন্য তোদের জন্ম। মেথর হয়ে জন্মেছিস বলে তোদের সামনের সব দরজা বন্ধ। তোদের সামনে শুধু একটি দরজা খোলা, তা কর্পোরেশনের গু-মুতের চাকরি। যা যা, আজ থেকে অনন্তকাল ধরে কর্পোরেশনের এই চাকরি বংশানুক্রমে তোরাই করে যাবি।

কিন্তু রামগোলাম জানে—আবদুস ছালাম একথা কখনো বলবেন না। এ ধরনের কথা বলার লোক তিনি নন। তার মধ্যে মমতা বলে কিছুই নেই, আছে শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা। রামগোলাম অনুভব করে এই ঘৃণা আর ক্ষমতা দিয়ে বড় সাহেব দুমড়ে মুচড়ে দেবেন।

তন্দ্রামতন এসে গিয়েছিল রামগোলামের। গুরুচরণ যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, ভয় পেয়ো না রামগোলাম। হরিজনদের জীয়নকাঠি তোমার হাতে। তুমি যদি থেমে যাও, ওরা যাবে কোথায় ? চাকরি পাবে না তারা। ভিক্ষুক হবে তারা। শহরের অলিতে গলিতে, বাজারে-মার্কেটে ভিক্ষে করে বেড়াবে। বলবে—দুদিন খেতে পাই নি বাবু, একটা টাকা দেন গো, রুটি কিনে খাব। আর জোয়ান মেয়েরা কী করবে জান ? দেহ বেচবে। সাহেব পাড়ার বেশ্যা হবে। টাইগারপাসের আধো-আলোর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বলবে—বেশি না দশ টাকা দিলে চলবে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল রামগোলাম। সটান দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলল, তা হবে না, তা হতে দেব না। জান দেব, মেথরদের পেটে লাথি মারতে দেব না। ■